দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বঙ্গ ভাগ নয়, পাকিস্তান ভাগ
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এক অনন্য ইতিহাস — পৃঃ ২২

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি
— পৃঃ ১৮

৭২ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ৬ জুলাই, ২০২০।। ২১ আষাঢ় - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

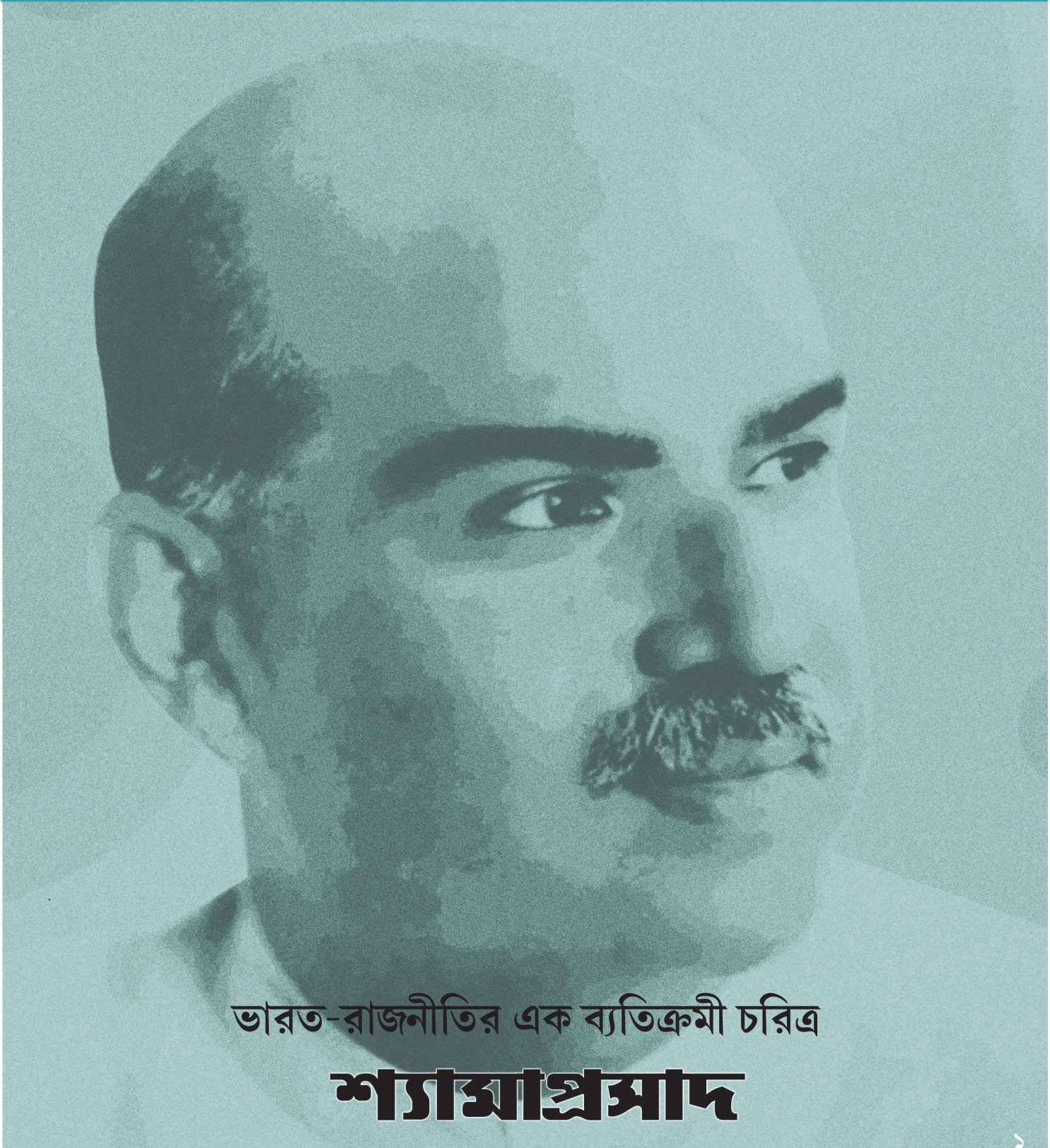

ভারত-রাজনীতির এক ব্যতিক্রমী চরিত্র

শ্যামাপ্রসাদ

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২১ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৬ জুলাই - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

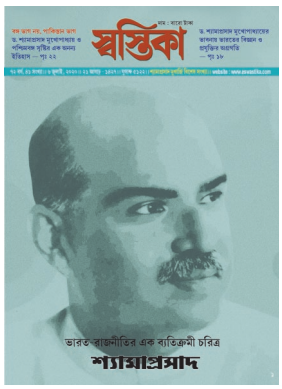

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

হিন্দুর বিষাদরোগ নিরাময়ের নিদান ▯ ডা: আর এন দাশ ▯ ৫

চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ▯ সৌমিত্র সেন ▯ ৭

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, শ্যামাপ্রসাদ ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ ▯ মোহিত রায় ▯ ৯

শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ১১

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ▯ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১২

শ্যামাপ্রসাদ : হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দিশারি ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১৪

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১৮

বঙ্গ ভাগ নয়, পাকিস্তান ভাগ : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এক অনন্য ইতিহাস ▯ বিমল শংকর নন্দ ▯ ২২

চীনের আধিপত্যকে ধ্বংস করতে ভারতের মানসিক ও পেশীশক্তি দুটোই দরকার ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৬

তপশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২৮

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের এক ইঞ্চি জমিও কেউ দখল করতে পারেনি ▯ মনীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩২

চিঠিপত্র ▯ ৩৪

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত-রাজনীতির এক ব্যতিক্রমী চরিত্র শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতির এক অতীব উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁহার সীমিত রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব শুধু বঙ্গে নয়, বঙ্গের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহা সুদূর কাশ্মীরেও বিস্তৃত। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক প্রভাবকে মাত্র দুইজন বঙ্গসন্তান প্রশ্নের মুখে ফেলিয়াছিলেন। প্রথমজন অবশ্যই সুভাষচন্দ্র বসু এবং দ্বিতীয়জন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে এবং পরে প্রবলপ্রতাপান্বিত নেহরু জমানায় সুভাষ ও শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় আর কোনো জাতীয় নেতাই নেহরু ও কংগ্রেসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া জাতীয় রাজনীতিতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেই অর্থে বিচার করিলে এই দুই বঙ্গসন্তানই ভারতীয় রাজনীতিতে এক সম্ভ্রম উদ্রেককারী স্থান দখল করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদের পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ, বাগ্মী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে আশুতোষের কর্মকালকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগও বলা চলে। আপোশহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী আশুতোষ সাধারণ্যে 'বাঙ্গলার বাঘ' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই সুপুত্র শ্যামাপ্রসাদ প্রমাণ করিয়াছেন তিনি যথার্থই একজন ব্যাঘ্র শাবক। পিতার ন্যায় শ্যামাপ্রসাদও ছিলেন চিরকালের এক আপোশহীন যোদ্ধা। নির্যাতিত মানুষের স্বার্থে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে বরাবর। দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার লড়াইয়ে কাশ্মীরে তিনি আত্মবলিদান করিয়াছেন। পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় শ্যামাপ্রসাদও ছিলেন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী। শিক্ষাবিদ হিসাবেই তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ। অদ্যাবধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্যের মহিমাটি ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আমলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত সংস্কার সাধন হয়। ব্রিটিশ শাসকদের যাবতীয় বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষান্ত ভাষণের আয়োজন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ যে যশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া রাজনীতির আঙ্গিনায় আসিবার তাঁহার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ সুখের সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করিতে চাহেন নাই। কাজেই আর্ত ও পীড়িতের করুণ আর্তনাদ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। চল্লিশের দশকে যখন অবিভক্ত বঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর মুসলিম লিগের নারকীয় অত্যাচার নামিয়া আসিতেছিল, শ্যামাপ্রসাদ স্থির থাকিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ না বুঝিতে পারিলেও শ্যামাপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ যদি মহম্মদ আলি জিন্নাহর মুসলিম লিগের করতলগত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। জিন্নাহর করাল গ্রাস হইতে তিনি সেদিন অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি ছিনাইয়া আনিয়া পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কারণেই বাঙ্গালি হিন্দু শ্যামাপ্রসাদের নিকট জন্মজন্মান্তরের ঋণী হইয়া থাকিবে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্যামাপ্রসাদ না থাকিলে বাঙ্গালি হিন্দু আজ বিলীয়মান হইত। শ্যামাপ্রসাদের স্বল্প রাজনৈতিক জীবনের আর একটি বড়ো কাজ, কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহর বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন। শেখ আবদুল্লাহর অন্যায্য দাবিগুলিকে নেহরু মানিয়া লইলেও শ্যামাপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন ইহার ফলে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ঘটিবে এবং ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইবে। 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'—এই ডাক দিয়া শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর অভিযান করিয়াছিলেন। সেখানেই শেখ আবদুল্লাহর কারাগারে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর সাত দশক পরে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্যামাপ্রসাদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্যামাপ্রসাদ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্বল্প জীবনকালে তিনি যে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, ভারত ইতিহাসে তাহা স্বর্ণোজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহাকে আমাদের শত সহস্র সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সুভাষিতম্

বহবো গুরুবো লোকে শিষ্য বিত্তপহারকাঃ।

ক্বচিতু তত্র দৃশ্যন্তে শিষ্যচিত্তাপহারকাঃ।।

জগতে শিষ্যের বিত্তহরণকারী গুরু অনেক দেখা যায়। কিন্তু শিষ্যের চিত্তহরণকারী গুরু ক্বচিৎ দেখা যায়।

হিন্দুর বিষাদরোগ নিরাময়ের নিদান

ডাঃ আর এন দাশ

হিন্দুদের তথা সারা পৃথিবীর জন্য অমূল্য ধর্মগ্রন্থ গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম 'অর্জুন-বিষাদ যোগ'। যে অর্জুন অত্যাচারিত ভার্যার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাঞ্চালির কাছে অগ্নিসাক্ষী করে শপথ নিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এসেই ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লন যুদ্ধে অনেক আত্মীয়স্বজন মরে যাবে এই আশঙ্কায়। বাঙ্গালি হিন্দু কেন, সারা পৃথিবীর অমুসলমানরাই আজ এক নিরাশাবাদী অর্থাৎ নিহিলিস্টিক বা শূন্যবাদী অবসাদে ভুগছে! সবার মধ্যেই আজ অর্জুনের মতো কনফিউশন বা বিহ্বলতা। কী করব? এখান থেকেই পলিটিক্যাল করেক্টনেস অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশুদ্ধতার জন্ম।

স্যার যদুনাথ সরকারের লেখা 'মোগল যুগে হিন্দুদের যাতনা' শীর্ষক পুস্তিকাটির আদ্যপান্ত পড়ে আমার মনে হয়েছে, সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলেছে। আশ্চর্য লাগে হিন্দুরা এত সহ্য শক্তি পায় কোথা থেকে! পুরাকালের মহাঋষি কশ্যপের ভূমি, ভারতের আলেকজান্ডার বিক্রমাদিত্য মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের রাজ্য ও মহাকবি কলহনের রাজতরঙ্গিনীর কাশ্মীর থেকে ৫ লক্ষ হিন্দুকে রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া করল মুষ্টিমেয় জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা!

শ্রীমতী সরলা গঞ্জুকে তাঁর ছাত্ররাই তাঁকে প্রকাশ্য দিবালোকে মাঝ রাস্তায় গণধর্ষণ করে নির্মম ভাবে হত্যা করল। অথচ একজন কাশ্মীরি হিন্দুও হাতিয়ার তুলে প্রতিশোধ নেবার তাগিদ অনুভব করল না? বঙ্গপ্রদেশ আর পঞ্জাবকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হলো। সুরাবর্দির নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার দলিল, 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' লেখা হলো, অথচ সেই নরসংহারকারীকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির তালিকায় স্থান দেওয়া হলো? বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগার চলে এলেন নীচের সারিতে! আজ থেকে ৫০ বছর পরে, বাঙ্গালি হিন্দু বলে আর কিছু থাকবে না! থাকবে শুধু সাদা কাপড়ে ঢাকা বাঙ্গালি মুসলমান স্বাধীন বৃহত্তম বাংলাদেশের সভ্য নাগরিক নাম নিয়ে। আজ বহু বিশ্বাসঘাতক বাংলাদেশি মুসলমান এবং তথাকথিত নামিদামি হিন্দু নামধারীরা নির্দ্বিধায় তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমার আগের বহু লেখায় 'বয়েলিং ফ্রগ' আর স্টকহোম সিনড্রোমের কথা লিখেছি। আজ হিন্দু বাঙ্গালি তথা ভারতীয়ের হৃদয়ে যে নিহিলিস্টিক ডিপ্রেশন চলছে তারই সম্বন্ধে বলব। 'বয়েলিং ফ্রগ সিনড্রোম' মানে একটি জীবন্ত ব্যাং-সহ জলপাত্রের উত্তাপ ক্রমশ নিম্ন থেকে উচ্চতর করতে থাকলে এক সময় অনুষ্ণশোণিত প্রাণীটির সহ্য ক্ষমতা অতিক্রম করলে, লাফ দিয়ে পালানোর পরিবর্তে আত্মহত্যার পথটিকেই বেছে নেয়। হিন্দুদের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। 'স্টকহোম সিনড্রোম' হচ্ছে, ১৯৭৩ সালে ঘটা সুইডেনের স্টকহোমে জন এরিখ ওলসন এবং ক্লার্ক ওলফসন নামে তুই ব্যাঙ্ক ডাকাত ৩ জন মহিলাকে ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত কুঠরিতে ৬ দিন বন্দি করে রাখে। আদালতে দেখা যায়, সেই বন্দিনীরা উদ্ধারকারী পুলিশকে নয় , বরং ওই দুই অপরাধীকেই সমর্থন করছে। অদ্ভুত তাই না, হিন্দুদের দশাও হয়েছে তাই! তাইতো ইফতার পার্টি হিন্দুরাই দেয়। লেই হিন্দুদের দৃষ্টিতে দরিদ্র হিন্দু হলো বজ্জাত আর ফেজ টুপিপরা মুসলমান হলো ভাইজান।

আমরা ১০০০ বছরের দাসত্ব করে এবং নিজেদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশি আক্রমণকারী ও অত্যাচারী মুসলমান আর খ্রিস্টানদের সপক্ষে কথা বলছি। হায়রে হিন্দু বাঙ্গালি!

এবার নিহিলিস্টিক ডিপ্রেশন বা অবসাদের কথা বলি। এই শব্দটা আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রেডেরিক নিৎসে নামের এক জার্মান দার্শনিকের কাছ থেকে। তিনি মনুষ্যজীবনের অস্তিত্বকে মূল্যহীন বলতেন। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কী? আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান অথবা দর্শনশাস্ত্র কোনোটাই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। পাশ্চাত্যদেশের ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদ বলে ভোগ করো, যাকে বলে ভোগবাদ বা হেডোনিজম। আবার এর বিপরীত দিকে হচ্ছে আদর্শবাদ বা আইডিয়ালিজম। উগ্র ইসলামিক মজহব বা কট্টর কমিউনিজম বা সাম্যবাদও এক প্রকারের আদর্শবাদ। বুদ্ধবাবু কিংবা ত্রিপুরার মানিকবাবু কীরকম সাদামাটা আদর্শবাদী জীবনযাপন করতেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়ার জন্য উড়ন্ত 'প্লেনের অ্যালের' মধ্যে নামাজের ধুমও হলো অতি উগ্র আদর্শবাদ। এরা বলে এই বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে আর কোনো সত্তা নেই। মানুষের বর্তমানের এই জীবনটাই শেষ কথা। পরলোক বলে কিছু থাকে না। সুতরাং ভোগ করো। চুষে নাও, শোষণ কর। একেই বলে টোটালিটারিয়ানিজম বা সর্বগ্রাসবাদ। তাদের কথায় স্ত্রীলোক হলো উর্বর জমি বা চাষের জমি। কে যেন বলেছিল, 'জেনানা হলো জেহাদি তৈরির কারখানা আর মাদ্রাসা হচ্ছে জেহাদিদের আঁতুড়ঘর'। কমিউনিস্টদের শব্দকোষে মহিলা মানেই স্টেট প্রপার্টি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা নয়। আব্রাহামিক ধর্মের অন্তর্গত ইহুদি, খ্রিস্ট আর ইসলামে ভোগবাদের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবনধারণ। বৈদিকধর্ম অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই হচ্ছে, আত্মার অমরত্ব, সকাম ও নিষ্কাম কর্মের ভিত্তিতে পুনর্জন্মবাদ আর জীবনের অন্তিমক্ষণে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং ভোগের বদলে ত্যাগের কথাই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে চার্বাক দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' বলা হয়েছে। কে জানে চার্বাক ঋষি চীনে জন্ম নিয়ে কমিউনিজমের সৃষ্টি করেছিলেন কিনা! বিশেষ করে আত্মঘাতী বাঙ্গালি হিন্দুদের মধ্যে এই অর্বাচীন ইজমের নামে উন্মাদ কিছু লোক ছিলেন যেমন অবনী রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও মোহিত ব্যানার্জির মতো কমরেডদের নাম সবার আগে মনে আসছে। এরা আবার বিশ্বজুড়ে ইসলামের সদাবাহার প্রেমীও বটে। চীনের উইঘুরে মুসলমানদের উপর কমিউনিস্ট সরকারের জিহাদি-মগজ ধোলাই প্রক্রিয়ায় এনারা কিন্তু নিশ্চুপ থাকেন অজ্ঞাত কারণে।

ভারতে যত ধর্মান্তরিত মুসলমান বা খ্রিস্টান আছেন সকলের পূর্বপুরুষই হিন্দু ছিলেন। ইন্ডিয়া টিভির সাংবাদিক রজত শর্মার আপ কী

আলাদতে আসাদুদ্দিন ওবেসি ও জাভেদ আখতারকে ডাঃ সুব্রমনিয়াম স্বামীর এটাই ছিল চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নার পূর্বজরা ছিলেন গুজরাটি হিন্দু । 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা'র কবি আল্লামা মহম্মদ ইকবাল ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে এইসব পাষণ্ডী পণ্ডিতের উর্বর জিন এসেছে কিন্তু হিন্দু মাতার ডিম্বাণু থেকেই। তাই ঊষর মরুভূমির দুর্দান্ত দস্যুরা, বেছে বেছে হিন্দু 'মাই আর গাই'-কেই লাঠ করতো। কেন তাদের মধ্যে এই সুপ্রিমাসি বা প্রভুত্বের দম্ভ? পৃথিবীজুড়ে আজ ইসলামসভীতি বা ইসলাম ফোবিয়ার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে ১৪০০ বছরের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া যে জাতি, ধর্মের নামে প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব ধর্মের বিস্তার করেছে— সেটা কি সত্যি কোনো মানবসভ্যতার উপযোগী কল্যাণকারী কোনো মতবাদ নাকি লেনিন-স্টালিনের সাম্যবাদ বা হিটলার-মুসোলিনির ফ্যাসিবাদের মতো ক্ষণস্থায়ী এক মতবাদ মাত্র?

ইসলামের ভিত্তিতে সর্বত্র নিজেদের এক আলাদা জাতিসত্তা তৈরি করছে আর সেটাই হচ্ছে তাদের মস্তবড়ো ভুল। যে কোনো দেশে প্রবেশমাত্র, তাদের জন্য সব কিছুই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। দেশের মধ্যে দেশ, শহরের মধ্যে শহর, গ্রামের মধ্যে গ্রাম। ভাষার মধ্যে ভাষা, ধর্মের মধ্যে ধর্ম। পরিচ্ছদ, খাওয়াদাওয়া— সবই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট স্বতন্ত্র এক ধ্বংসকারী মতবাদ। আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো দেশই আজ আর ইসলামের তরবারির আঘাত থেকে মুক্ত নয়। তাই ভাবতে হবে এর শেষ কোথায়? খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর চৈনিক দার্শনিক, সান জু তাঁর 'দ্য আর্ট অব ওয়ার' গ্রন্থে বলেছেন, শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে তার সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তাই বাইবেল ও গীতাজ্ঞানের থেকেও কোরান পড়া বেশি দরকার।

পয়গম্বর মহম্মদ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কোরান, হাদিস আর শরিয়া-ইসলামের এই তিন স্তম্ভের প্রতি জীবন বিসর্জনদায়ী অকুণ্ঠ আনুগত্যের রহস্যটি কী, জানতে হবে। আমি বলব ভোগবাদ। এই পৃথিবীতে গনিমতের মাল হিসেবে কাফেরের ধনসম্পদ লুণ্ঠন, অপহৃত কাফের কন্যার যৌনশোষণ এবং মৃত্যুর পর বেহেস্তের ৭২ হুর আর গেলেমনের অলীক কল্পনায় মশগুল জিহাদি অন্য ধর্মে যা অনৈতিক তাকে নস্যাৎ করে অবলীলায় প্রাণাহুতি দিতে পিছপা হচ্ছে না। অমুসলমান সব দেশেই তারা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য পার্টি তৈরি করে ফেলছে অল্পদিনের মধ্যেই। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্ততপক্ষে আমাদের শেখা উচিত তাদের 'তাকিয়া' নামক ধূর্ত কৌশলগুলি। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব খাজা সালিমুল্লা মুসলিম লিগের সৃষ্টি করেন মাত্র ৯ কোটি মুসলমানের জন্য। তখন ৯৫ শতাংশ ভারতীয় মুসলমান হিন্দুদের থেকে আলাদা এক পবিত্র স্থানের কল্পনা করে পাকিস্তানের স্থাপনা করেছিল। কিন্তু মাত্র ৫ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তানে গিয়েছিল। বাকিরা সব থেকেই গেল ভারতে। আজ তারা সংখ্যায় ৩০ কোটি। অল ইন্ডিয়া মিমের কর্তাব্যক্তি ওয়ারিশ পাঠান ও তার সহযোগী আকবরউদ্দিন ওয়েসি গোটা ভারত থেকেই 'হিন্দু হঠাও' হুংকার দিচ্ছে। ব্রিটেনে তাদের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ, কিন্তু তারা ইসলামিক শরিয়া স্থাপন করে ইংল্যান্ডকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার হুমকি দিচ্ছে। লন্ডনের কুখ্যাত ইমাম আঞ্জেস চৌধুরী কুইন ভিক্টোরিয়াকে ধর্মান্তরিত হবার আহ্বান জানাচ্ছে। বেআইনি ও গুপ্তভাবে নিজেরাই মসজিদে ইমামের সাহায্যে সম্পত্তি হস্তান্তর ও পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে নিচ্ছে। রাজনৈতিক লাভের বশবর্তী হয়ে স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের ধান্দাবাজ মুসলমানরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল। তারপরে সিপিএমের তাঁবেদারী করেছে গত ৩৪ বছর ধরে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএমের দুই নেতা ও নেত্রী রাত্রের অন্ধকারে হিন্দু গৃহবধূদের সিঙ্গুরে ও কেশপুরে পাঠাত মুসলমান গুন্ডাদের রান্না আর গা-হাত-পা টিপে দেওয়ার জন্য। একজনের নাকি পোষা কুমির ছিল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। এখন মুসলমানরা তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুশূন্য করার জন্য মমতার প্রশাসনের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে।

যেদিকে হাওয়া বইবে তারা সেদিকেই চলে আসবে। বিজেপির হাওয়া দেখে তারা অনেকেই খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছে। গোপনে যোগাযোগ করছে। এখানেই হচ্ছে নিৎসের লেখা পুস্তক 'দাস স্পেক জরথুস্টের' সুপারহিউম্যানের চরিত্র। একদিকে আছে মধ্যযুগীয় ধর্মের গোঁড়ামি যা আদর্শবাদ নামে পরিচিত। অন্যদিকে আছে হেডোনিজম বা ভোগবাদ। এই দুটি মতবাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে ইসলামের সুপারহিউম্যান বা সর্বোচ্চমানের শ্রেষ্ঠ মানুষরা। এটা অবশ্য শ্লেষাত্মক ভাবে বলেছি। নিৎসে সুপারহিউম্যানে যেসব গুণাবলির কথা বলেছেন, তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবে না মধ্যযুগীয় বর্বরা। জর্জ সোরস-সহ ১২ জন বিলিওনেয়ার যারা সারা পৃথিবীর অর্থব্যস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তারাই এখন নতুন যুগের নিৎসের প্রবর্তিত সুপারহিউম্যানের খোঁজে নিযুক্ত আছেন। পুঁজিবাদী আমেরিকা বা ইউরোপের হেডোনিজম ইসলামের চরম শত্রু। আবার নর্থ কোরিয়া আর চীনের কমিউনিজম পশ্চিমের ক্যাপিটালিজমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র'— এই নীতি নিয়ে মুসলমানরা সাময়িকভাবে বামপন্থীদের শয্যাসঙ্গী হতে রাজি হয়েছে বটে ,তবে ভবিষ্যতে কী হবে তা ভবিতব্যই বলতে পারেন। সব দেশেই আজ স্বদেশি ভাবনা আর জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। ইসলামের নৃশংস নীতির বিরুদ্ধে ভোগবাদী পশ্চিমের দেশগুলি আর তথাকথিত সাম্যবাদী চীনও স্বদেশি সংবিধান পরিবর্তনের কাজে মন দিয়েছে।

হিন্দুরা একত্রিত হলে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সনাতন ধর্মই পারবে এই আত্মবিধ্বংসকারী টোটালিটারিয়ান মতবাদের মোকাবিলা করতে। তাই সারাবিশ্ব অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে ভারতের দিকে মুখ করে, কীভাবে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সেকথা ভেবে। জানেন কি সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের আহ্বানে বিশ্বের অশান্ত অঞ্চলগুলিতে সব থেকে বেশি সংখ্যায় শান্তিসেনা পাঠায় ভারত? বিশ্বে ভারতের সৈন্যশক্তি চীনের পর দ্বিতীয় স্থানে আছে।

আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে। সম্মিলিত ইউরোপের ক্ষমতা নেই এই দুর্দান্ত দস্যুকে দমন করে সৈন্যশক্তি দিয়ে। তাই অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে, ভারত কবে আবার 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। অতি সম্প্রতি ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করেছে। ভারতের জনশক্তি, সামরিক সামর্থ্য, স্থিতিশীল অর্থব্যবস্থা, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দৃঢ়তা, প্রাচীন ঐতিহ্য আর গৌরবময় সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের বৈদিক অধ্যাত্ম ও সাম্যবাদই বিশ্বত্রাস ইসলাম আর সাম্রাজ্যবাদী চীনের কমিউনিজমের উপযুক্ত ওষুধ হবে! ■

চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সৌমিত্র সেন

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় ছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের ত্রাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে অনেক অজানা, গোপন ও অকথিত তথ্য আছে— তিনি ছিলেন আমাদের দেশের এক অবহেলিত বীর ও নায়ক। এখানে পশ্চিমবঙ্গের জনকের অসামান্য ভূমিকার কিছুটা ফুটিয়ে তুলে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার চেষ্টা করেছি। এই সঙ্গেই আমি তাঁর এই অপ্রতিরোধ্য প্রবল সংগ্রামের ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন 'বাঙ্গলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ছিলেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় ১৯৪২ সালে বঙ্গপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং স্বাধীন ভারতে তিনি নেহরু সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরবর্তীতে সেটি ভারতীয় জনতা পার্টিতে পরিবর্তিত হয়— যা কিনা আজকের দিনে ভারতের শাসকদল। আমরা অনেকেই তাঁর এই বর্ণময় জীবনের ও জাতিগঠনে তাঁর নেতৃত্বের খবর রাখিনি।

মুসলমান জনাধিক্যের জন্য মুসলিম লিগ পুরো বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি দাবি করে। কিন্তু অবিভক্ত বঙ্গের পশ্চিমাংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লিগের অন্যায্য চাপ চলতেই থাকে। এই সংকটকালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় বাঙ্গালি হিন্দুদের পরিত্রাতা হিসেবে মুসলিম লিগের বিরোধিতায় আবির্ভূত হন। এই চরমতম সংকটের মুহূর্তে তিনি হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় ভারতভাগের প্রবল বিরোধী ছিলেন কিন্তু পরে মুসলিম লিগের হঠকারিতায় দেশভাগ যে অনিবার্য তা উপলব্ধি করলেন এবং তখনই ঠিক হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্প করলেন। সেইমতে বঙ্গভাগের দাবি তুলে পশ্চিমভাগকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন।

সেই সময় বঙ্গপ্রদেশের মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দি স্বাধীন বাঙ্গলার দাবি তুললেন। যা ভারত কিংবা পাকিস্তান কারোর সঙ্গেই যাবে না। সুরাবর্দি জানতেন যে বঙ্গপ্রদেশ ভাগ হলে, অর্থনৈতিক ভাবে পূর্ববঙ্গের ক্ষতি। কারণ কয়লাখনি, পাটকল, শিল্প প্রভৃতির বেশির ভাগটাই পশ্চিমভাগে পড়ছে। তারপর তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে বড়ো শহর, বন্দর ও বাণিজ্য নগরী কলকাতাও হাতছাড়া হতে চলেছে। কিন্তু মুশকিল হলো, তাঁর এই নীতি তার দলের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছিল।

অবাক করে মহম্মদ আলি জিন্না ব্যাপরটির গুরুত্ব বুঝে তাকে নীরবে সমর্থন

দিলেন। শুরু হলো লড়াই। কংগ্রেস নেতৃত্ব তৎক্ষণাৎ এই দাবি প্রত্যাখ্যান করল।

প্রবল বিরোধিতা শুরু করলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়। তিনি বোঝালেন, এটা মুসলিম লিগের চাল। মর্যাদাপূর্ণ কলকাতা হাতছাড়া হওয়া ও পশ্চিমভাগের দখল হারানোর ভয়ে মুসলিম লিগ তথা জিন্না সুরাবর্দিকে ঢাল করে এই চাল চেলেছেন। স্বাধীন বাঙ্গলা আসলে পাকিস্তানের প্রভাবেই চলবে। তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি আরও বললেন, তিনি আলাদা পশ্চিমবঙ্গ চান যা জিন্নার তথা পাকিস্তানের প্রভাব থেকে সর্বৈব মুক্ত হবে।

পাকিস্তানের হাত থেকে বাঙ্গলার পশ্চিম অংশকে রক্ষা করতে তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। এই দাবির ভিত্তিতে বাঙ্গলার বিধানসভায় তিনটি পৃথক ভোট সংগঠিত হয়েছিল। কী কী সেশন, কারা ভোট দিয়েছিল, কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই ভোট থেকে?

১. জয়েন্ট সেশন : এখানে সমস্ত সদস্যের ভোটে ১২৬-৯০ ব্যবধানে ভারতীয় কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যোগদানের বিপক্ষে রায় দেওয়া হলো।

২. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের সেশন : এখানে ১০৬-৩৫ ভোটে বাঙ্গলা ভাগের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হলো।

৩. অমুসলমান এলাকার সদ্যসদের সেশন : এখানে ৫৮-২১ ভোটে বাঙ্গলা ভাগের পক্ষে রায় গেল।

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙ্গলা ভাগের পক্ষে যে কোনো সেশনের একটি সিঙ্গেল মেজরিটি ভোটের ফলস্বরূপ, বাঙ্গলা ভাগের পক্ষে সায় দেওয়া হলে। ঠিক হলো, ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতকে স্বাধীনতা হস্তান্তর কর হবে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইন অনুসারে।

হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষায় মুসলিম লিগের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়। তিনি ও তাঁর সমর্থকরা সনাতন হিন্দুধর্মের সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি এবং এদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথাই প্রচার করতেন । কিন্তু তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের এই বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের নোয়াখলিতে হিন্দু গণহত্যায় প্রবলভাবে নাড়া খায় ও ভেঙে পড়ে। ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার পরেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় মুসলমান প্রধান ও মুসলিম লিগ দ্বারা শাসিত দেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন।

তাঁর প্রবল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের সামনে জিন্না, সুরাবর্দি ও অন্য মুসলমান নেতারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন এবং তাঁদের পুরো বঙ্গপ্রদেশের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। ভারত কেশরীর সিংহগর্জনে বাঙ্গলার পশ্চিমাংশের হিন্দু প্রধান ভূখণ্ড নিয়ে সৃষ্টি হলো পশ্চিমবঙ্গ।

যদি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়ের প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ না তৈরি হতো তাহলে জেহাদি মুসলমানদের কবল থেকে বাঙ্গালি হিন্দুদের রক্ষা করা যেত না এবং তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাও দেওয়া যেত না। যদি পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি না হতো তাহলে হিন্দুদের সেই দশা হতো, যা আজকে বাংলাদেশে বাঙ্গালি হিন্দুদের এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের হচ্ছে।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস দল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়কে ডেকে প্রথম ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হতে আহ্বান জানায়। তিনি রাজি হন এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে প্রশংসনীয় কাজ করে নজর কাড়েন সকলের। ১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা ও ১৯৫১ সালে সিন্ধ্রি সার কারখানার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশভাগের পর হিন্দুদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অবস্থায় খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ক্রমাগত আসতে থাকা উদ্বাস্তুদের স্রোত পরিদর্শন করতে তিনি নেহরুকে আমন্ত্রণ জানান। সংসদে তিনি এই সমস্যার সুরাহা হবে কী করে তা পেশ করেন। কিন্তু সবই বৃথা হয়।

১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষর হওয়াতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় আরও ভেঙে পড়েন এবং ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। এর কিছুকাল পরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। তিনি চেয়েছিলেন এই দলে যেন সকল বর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকার থাকে। কিন্তু বাস্তবে চিত্র ছিল ভিন্ন।

১৯৫১ সালে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয় যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর আশীর্বাদে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি করেন। ১৯৫২-র নির্বাচনে তিনি উত্তর কলকাতা থেকে জয়লাভ করেন এবং কতিপয় আসন জিতেও অন্য দলের সঙ্গে নিশে কংগ্রেসের বিরোধিতায় নামেন। পার্লামেন্টের তিনি বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন।

কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায় খুবই বিচলিত বোধ করেন। ৩৭০ ধারার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করেন । কাশ্মীরে বহু মানুষের সমাগমে তিনি কাশ্মীরবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে ভারতের অন্য প্রদেশে যে সংবিধান চলছে, কাশ্মীরে সেই এক সংবিধানের নীতি প্রচলিত হবে। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের ভারতীয় সংবিধানের ন্যায় বিচার দেব, নাহলে আমার জীবন দেব।" ১৯৫৩ সালে যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবার কাশ্মীর ফিরে আসেন তখন কংগ্রেস পরিকল্পনা করছিল তাকে গ্রেপ্তার করার, কিন্তু তা না করে তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলোএবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। কারাগারে বন্দীদশায় তাঁর মৃত্যু হয় যা আজও দেশবাসীকে ব্যথা দেয়।

একথা বলাই যায় যে, ঈশ্বরের প্রেরিত দূত হিসেবে হিন্দুদের ত্রাতা রূপে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়ের আগমন ঘটেছিল । তিনিই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা এবং শান্তিপ্রিয়, মুক্তিকামী, উদার সহনশীল হিন্দু বাঙ্গালিদের উদ্ধারকর্তা। হিন্দু বাঙ্গালিদের শ্যামাপ্রসাদ মুখেপাধ্যায়ের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানানো উচিত। সেই কালজয়ী মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটলে হিন্দু বাঙ্গালিরা এক অস্তিত্বহীন জাতিতে পরিণত হতো। ■

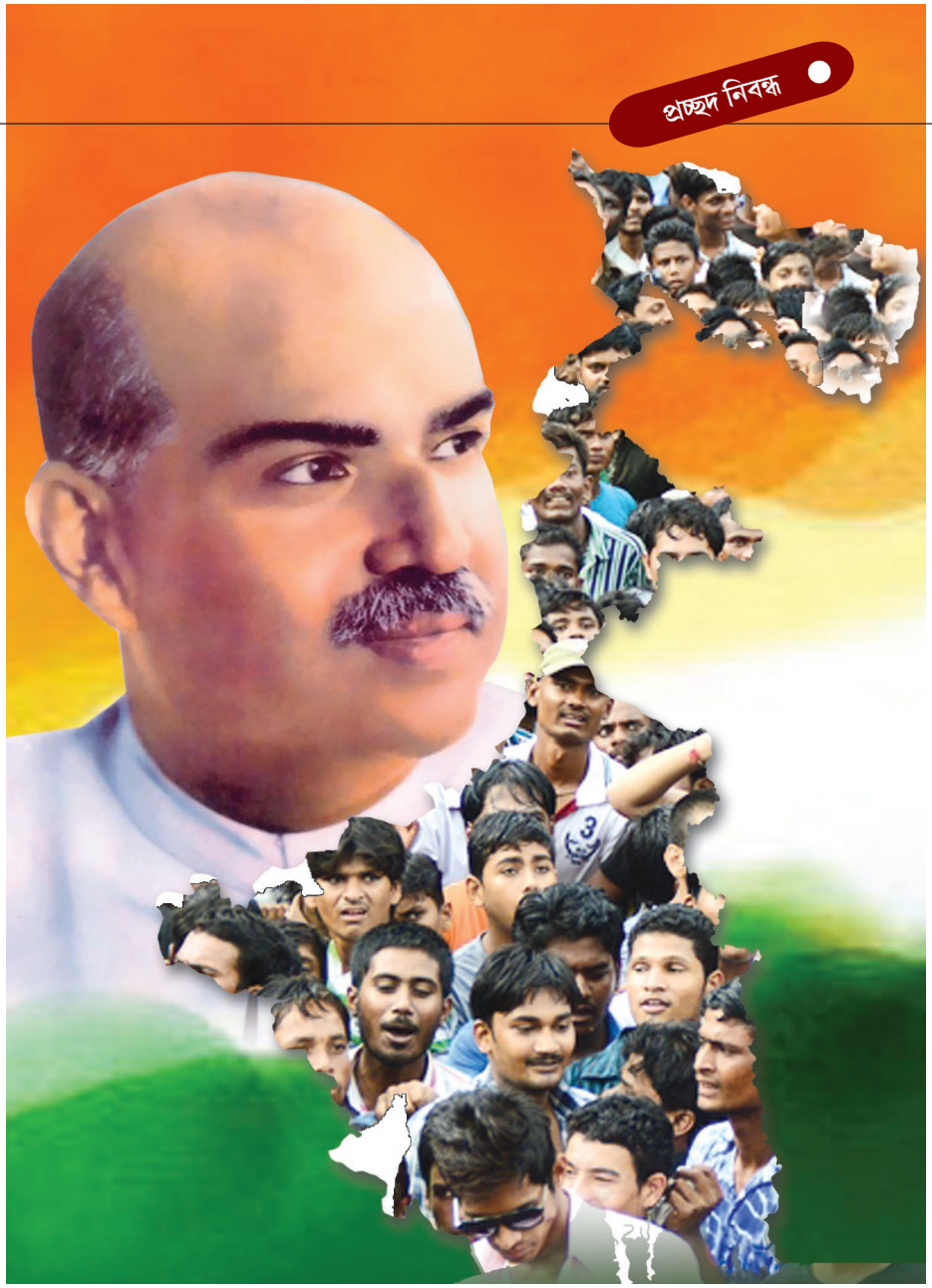

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, শ্যামাপ্রসাদ ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ

মোহিত রায়

সারা পৃথিবীতেই ইসলামি দেশ থেকে অন্য ধর্মের মানুষেরা বিলীন হয়ে গেছে, আজও হচ্ছে। ভারত বিভাজনের সময়ই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটি বুঝেছিলেন। ২ মে ১৯৪৭ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে এক পত্রে জানালেন বঙ্গ ভাগের এবং হিন্দু মুসলমান জনবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা। তিনি জানতেন যে ইসলামি শাসনের বাঙ্গলা থেকে হিন্দুরা যে উদ্বাস্তু হয়ে আসতেই থাকবেন, সেই বাঙ্গালি হিন্দু যাবে কোথায়। তিনি পত্রে বললেন যে বঙ্গ ভাগ না হলে ২ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দুকে বাঙ্গলা থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আর বঙ্গ ভাগ হলে পূর্ববঙ্গ থেকে ৯০ লক্ষ হিন্দু চলে আসবে আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬০ লক্ষ মুসলমান চলে যাবে। তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য আগেভাগেই তৈরি করলেন বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ।

শ্যামাপ্রসাদের ভাবনায় কোনো ভুল ছিল না। পাকিস্তান হবার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইসলামি অত্যাচারে হিন্দুরা চলে আসতে থাকলেন। এই উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্বের ব্যবস্থা ছিল নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এ। এর ৫নং ধারা অনুযায়ী, যে ব্যক্তির মা ও বাবা অবিভক্ত ভারতে জন্মেছিলেন, যাকে বলা হয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি (person of Indian origin)– সেই ব্যক্তি উপযুক্ত ফর্মে আবেদন করে নাম নিবন্ধীকরণ করলে তিনি ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবেন। ২০০৪ সালের পর থেকেই ব্যক্তি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হলে তা গ্রাহ্য হবে না। উপরোক্ত ৫ নং ধারা অনুযায়ী উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পাবার অধিকারী। ১৯৭১ সালের আগে যে উদ্বাবাস্তুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন তাঁদের নাগরিকত্বের সমস্যা নেই।

শ্যামাপ্রসাদ শুরু থেকেই দাবি করেছিলেন জনবিনিময়ের, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তা মানলেন না। বরং উলটে বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ করতে ১৯৫০ সালে করলেন নেহরু-লিয়াকত চুক্তি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যা কিছু মুসলমান চলে গিয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগ ফিরে

এলেন। পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানকে নেহরু কাশ্মীর উপহার দিলেন আর পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানকে নেহরু উপহার দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে মুসলমান অনুপ্রবেশের। এরপর ১৯৭২-এ পূর্ব পাকিস্তান পালটে হলো বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ নাকি হবে ধর্মনিরপেক্ষ! ফলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সেই বাঙ্গালি হিন্দুর শত্রু নেহরুর মতোই ভাবলেন যে আর তো বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আসবে না। ফলে তাঁরা একটি সরকারি নোটিশ করে দিলেন যে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আর নাগরিকত্ব আইনের সেই সুবিধা পাবেন না। ফলে ১৯৭২ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিক হবার আর আইনি সুবিধা থাকল না।

ভারতের জোরে স্বাধীনতা পেয়ে যথারীতি কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামি সমাজ তার নিজের মূর্তি ধারণ করলো। শুরু হয়ে গেল পাকিস্তানি কায়দায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার। সংবিধান পালটে হলো ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম। হিন্দুদের উপর শুরু হলো দৈনন্দিন নিপীড়ন। আবার হিন্দু ঘর ছাড়তে করলো। বাঙ্গালি হিন্দু যাবে কোথায়? সেই এক গন্তব্য--- শ্যামাপ্রসাদের তৈরি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু নেহরুর উত্তরসূরিরা তো নেহরুর মতোই বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশের জন্য মুখিয়ে আছে। ফলে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাবার আইনি পথটি বন্ধ করে দিলেন। এবার যারা বাংলাদেশ থেকে আসবে, হিন্দু ও মুসলমান, তাদের জন্য অর্থের বিনিময়ে জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের ব্যবস্থা করা হলো।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের বলিদান বৃথা যায়নি। সেই মনীষীর পুণ্যে আজ গড়ে উঠেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, শ্যামাপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘের হাত ধরে। শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টার ফল হিন্দুর হোমল্যান্ড, আর সেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তু বেঁচে থাকবে বেআইনি অস্তিত্ব নিয়ে— তা কী করে মেনে নেওয়া যায়। সেজন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকার নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ চতুর্থবার সংশোধন করে নিয়ে এল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯। এতে বলা হলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে অথবা আশঙ্কায় যেসব ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে এসেছেন, যাঁদের পাসপোর্ট আইন ১৯২০ ও বিদেশি আইন, ১৯৪৬ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে— তাঁরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য হবেন না। এই উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-র ৫নং ধারা নিবন্ধীকরণ (Registration) অনুযায়ী বা ৬ নং ধারা-স্বাভাবিক করণ (Naturalisation) অনুযায়ী আবেদন করে নাগরিকত্ব পাবেন। তাঁকে ভারতে প্রবেশের পর পাঁচ বছর ভারতে থাকতে হবে। যে ব্যক্তি যেদিন ভারতে প্রবেশ করেছেন সেদিন থেকেই তিনি ভারতের নাগরিক হবেন। সেই ব্যক্তি আগের বেআইনি অনুপ্রবেশ বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কোনো মামলা থাকলে তা আর গণ্য হবে না। আবেনদনকারী ব্যক্তির বর্তমান কোনো সুবিধা বা অধিকার খর্ব করা হবে না।

এক কথায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা আগেই নাগরিকত্ব পেয়েছেন, এবার বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরাও নাগরিকত্ব পাবার অধিকার পেয়ে গেলেন। শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ সব নিপীড়িত বাঙ্গালি হিন্দুর আশ্রয়স্থল। এবার আমাদের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করে তোলা। আমাদের দায়িত্ব বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন। একমাত্র শক্তিশালী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে ধারণ ও লালন করতে পারবে। ■

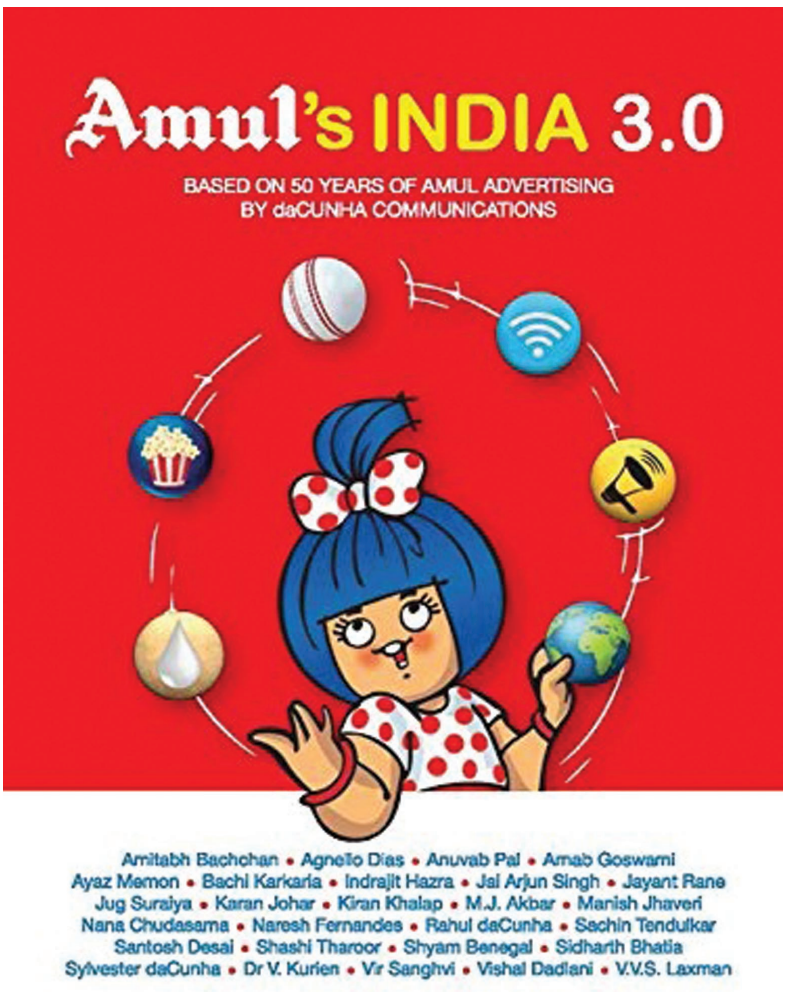

শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

১৯৩৪ সালের ৮ আগস্ট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে আসীন হলেন শ্যামাপ্রসাদ। পিতা-পুত্র কোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রসরতাকে প্রবল গতিসম্পন্ন করেছেন এমন উদাহরণ সম্ভবত একটিই— উপাচার্য হিসাবে স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আশুতোষের প্রয়াণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে উৎকর্ষতার যারপরনাই অভাব অনুভূত হয়েছিল, তা একাগ্রতায়, অধ্যাবসায়ে, সাধনায় ও প্রজ্ঞায় পূরণ করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ও প্রশাসনে দুজনেই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধন করেছিলেন। আশুতোষের হাতে উপাচার্যের দায়িত্ব ছিল ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এবং তারপর দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। জীবদ্দশায় পিতার শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। সামান্য সময়ের জন্য হলেও পরিচালনার কাজ একসঙ্গে করার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর সদস্য মনোনীত হন তিনি। তার কয়েকমাস বাদে পিতার মৃত্যু ঘটে। তারপর তিনি সিন্ডিকেটেরও সদস্য হলেন। তখন তার বয়স মোটে ২৩। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে অভাব অভিযোগ জানানোর একমাত্র পাত্র হচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৫ সালে একটি চিঠিতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন, ''ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে তুমি দেখিতেছি বাপ কা বেটা হইয়াছো। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে পারিবে না।'' ১৯৩৪ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ তথা কর্মবহুল যুগ হচ্ছে পিতার ১০ এবং পুত্রের এই চার বছর মেয়াদি উপাচার্য পদে আসীন হবার কালপর্ব। অনেকের মতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশলী কার্যকর্তা হিসেবে অনেকদিন থেকেই De facto উপাচার্য ছিলেন, ১৯৩৪ থেকে হলেন Dejure উপাচার্য। বিদায়ী উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দিও তাঁর নিয়োগে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

উপাচার্য পদ থেকে সরে যাবার পরও ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে যা বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষাচিন্তার নির্যাস রয়েছে। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বললেন, পরাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভারতবর্ষে নানা প্রান্তে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার মধ্যে ঐক্যসূত্রটি তুলে আনা দরকার। যখন ১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিচ্ছেন ততদিনে বুঝতে পেরে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা কেবল সময়ের অপেক্ষা। তাই উত্থাপন করলেন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ। এইভাবে বাঙ্গলার শিক্ষাবিদ হিসেবে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বললেন, জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখতে চাই যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি দিক চিহ্নিত করলেন যা পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষাবিদদের কাছে তা পথনির্দেশ হয়ে উঠলো। যেমন, সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জাতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া, দেশের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যস্ত ও নবায়িত করা, ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রয়োজনী উপাদানগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের পদ্ধতি।

ড. শ্যামাপ্রসাদকে ত্রিভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা সওয়াল করতে দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা যা ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষার ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অপরিহার্য। ভাষা সম্পর্কে তিনি গোলমেলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশের ভাষা বলে উপেক্ষা করেননি, আবার প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তার মধ্যেকার মণিমাণিক্য সংগ্রহে জোর দিয়েছেন। নারী শিক্ষার প্রতি যত্নবান শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান আছে। মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের সূচনা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আরও যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের, তা হলো কলকাতায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা; ফলিত পদার্থবিদ্যায় Communication Engineering পাঠ্যক্রমের আয়োজন, শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন, প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্য মিউজিয়াম স্থাপন ইত্যাদি।

শরীরচর্চা যে জাতি গঠনের অন্যতম বিষয়, তা বুঝেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে খেলাধুলার উন্নতিতে তাঁর অনন্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল। ১. ছাত্রদের খেলাধূলা এবং ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করলেন। ২. ঢাকুরিয়া লেকে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি রোইনিং ক্লাব। ৩. তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। ৪. ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা হলো। ইত্যাদি। ■

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন ও আরও নানান আঙ্গিক নিয়ে প্রভূত আলোচনা হলেও একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ হিসেবে, একজন সুদক্ষ উপাচার্য হিসেবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। শ্যামাপ্রসাদ কম বয়স থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে সরকারি বৃত্তিসহ প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৯ সালে আইএ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স-সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিএ পাশ করেন ১৯২১ সালে। আইএ ও বিএ দুটি পরীক্ষাতেই বাংলাতেও প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাশ করেন ১৯২৩ সালে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বড়দা রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ দু'জনের উৎসাহে বাড়ি থেকে মাসিক 'বঙ্গবাণী' সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকাতেই শ্যামাপ্রসাদ সাহস করে প্রথম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বিএল পাশ করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হন। ১৯২৬-এ তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাশ করে পরের বছরই ফিরে আসেন।

শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। এই বছরই মে মাসে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর সিন্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৪-এ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রায় দশ বছর পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৩৮ পর্যন্ত টানা চার বছর তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পিতা আশুতোষের শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি কার্যে পরিণত করতে শুরু করেন। বিজ্ঞান-সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্যামাপ্রসাদকে লেখা এক পত্রে লিখেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কাজে তুমি দেখিতেছি 'বাপকা ব্যাটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজি নয়।"

পদ্মের মধ্যে শ্রী লেখা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রতীকই মুসলিম লিগ সরকার পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই প্রতীক আর ফিরিয়ে আনা হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান করার জন্য অনুরোধ জানান। এই সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রথা ভঙ্গ করে বাংলায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেন। উচ্চশিক্ষা প্রসারে শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ভাষণ দেওয়ার জন্য ও কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে। ১৯৩৫ সালে শ্যামাপ্রসাদ ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের কোর্ট ও কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ ('মিল অমিল- জাতীয় আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র', 'ইতিকথা', সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৭১-১৮৭) লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো—(১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিংয়ে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪৬)।

কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, (২) বিহারীলাল মিত্রের অর্থানুকূল্যে মেয়েদের জন্য হোম সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ও হোম সায়েন্স শিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা এবং (৪) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে বাংলা বানানের সমতা এবং বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন। শেষোক্ত লক্ষ্যে দুটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিস্ট্রার ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি হলো— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা পরিভাষা সমিতি গঠন, রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তন ইত্যাদি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিক পরিমাণে যুক্ত করার। আশুতোষের অনুরোধে কবি ইতিপূর্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে বাংলার প্রশ্নপত্র রচনা করেন। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি বদলে বাংলায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেই কথা স্মরণ করে বলেন— ''বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটি গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাঙ্গলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লব উৎসব।'' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-রেজিস্ট্রার ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫১) লিখেছেন, ''মুসলমান ছাত্ররা সেই সমাবর্তন বয়কট করে কবির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশেও পিছপা হয়নি।''

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতীক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নটি পরিবর্তন করার ব্যাপারে বেশ কিছুকাল ধরেই আলাপ-আলোচনা চলছিল। অনেক কমিটি, মিটিং, বৈঠক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত জানার পর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ওপর বাংলায় 'শ্রী' অক্ষর শোভিত প্রতীক চিহ্নটি গৃহীত ও প্রচলিত হয়। ১৯৩৭-এ অখণ্ড বঙ্গে মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়। তারা এই 'শ্রী' ও 'পদ্ম'-কে ইসলাম-বিরোধী বলে অভিহিত করে। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন থেকে শ্রী ও পদ্ম সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৮-এর আগস্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিগ সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সত্ত্বেও তাঁকেই পুনর্নিয়োগ না করে শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক মুসলমান উপাচার্য নিয়োগ করে। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থারও সাম্প্রদায়িকরণের পথও প্রশস্ত হয়। ■

শ্যামাপ্রসাদ
হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দিশারি

বিনয়ভূষণ দাশ

ভারতের মহান সন্তান, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নানাবিধ কৃতিত্বে বাঙ্গলা তথা সারা দেশ গৌরবান্বিত। শিক্ষাবিদ , মানবিকতাবাদী, রাজনৈতিক — নানা গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে। কিন্তু মুসলিম লিগ ও বাঙ্গলার কমিউনিস্ট দল সর্বদাই তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে, তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ওই সময়ে (১৯৪১-৪৩) আর এক বাঙ্গালি, কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সে প্রসঙ্গে আসার আগে সংক্ষেপে ওই সময়ের বাঙ্গলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ওই সময়ে এ কে ফললুল হক বাঙ্গালি মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেলেও সাধারণভাবে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সংহতির নীতি জিন্নাহর লিগপন্থী নেতারা কিছুতেই বরাদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাঁরা নানা অছিলায় তাঁকে বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় প্রতিপন্ন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এজন্য তাঁরা বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে প্রচার শুরু করল যে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ইসলাম-বিরোধী। সুতরাং, প্রকৃত মুসলমানদের কাজ হবে উর্দু ভাষা ব্যবহার করা এবং ইসলাম সংস্কৃতি অনুসরণ করা। এই প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল ফজলুল হকের জনপ্রিয়তায় চিড় ধরানো। ফলে বাঙ্গলার নানা প্রান্তে 'উর্দু অ্যাকাডেমি' গড়ে তুলে বাংলাভাষা বিরোধী প্রচার শুরু হলো। ড. শ্যামাপ্রসাদ জিন্নাহ ও তাঁর লিগপন্থী সাগরেদদের এই হক-বিরোধী প্রচার মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির উন্নতিতে আস্থাশীল নেতা ফজলুল হকের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুজনের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠল 'বেঙ্গলি প্রোটেকশন লিগ' নামে এক সংস্থা। এটির প্রতিষ্ঠাকাল সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ সাল। এভাবে তৎকালীন বাঙ্গলার দুই সুপরিচিত রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যক্তিত্ব পরস্পরের কাছাকাছি এলেন, বাঙ্গলার রাজনীতি এক নতুন মাত্রা পেল। তাঁরা প্রচার করলেন, বাঙ্গালি মুসলমানেরা যেন উর্দুভাষীদের প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। তাঁদের এই উদ্যোগ সফল হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান

পরিস্থিতিও রাজ্য সরকারের কল্যাণে একই রকম। যাইহোক, মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান চরম সাম্প্রদায়িক নীতি ও কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফজলুল হক ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লিগের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি লিগের সঙ্গে আঁতাতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে, বেরিয়ে এলেন এইভাবে। এই সময়ে বাঙ্গলার রাজনীতিতে কংগ্রেসের একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ছিল যেটির নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু। তিনি ফজলুল হককে লিগের কবল থেকে বের করার চেষ্টায় সফল হন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

প্রসঙ্গত, মুসলিম লিগের সঙ্গে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা গঠনের পশ্চাৎপট একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ যদিও এই ১৯৩৫ সালের এই আইনকে মেনে নেয়নি তবুও তারা নির্বাচন ঘোষিত হলে তাতে অংশগ্রহণ করে। এই প্রথম সাধারণ নাগরিকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। সেই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল কংগ্রেস, ১৯২৭ সালে স্থাপিত ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দল। এই কেপিপি পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সেই সময়ে মুসলিম লিগের তত সমর্থন ছিল না বাঙ্গলায়। তাঁদের প্রভাব মূলত বাঙ্গলার মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নির্বাচনে লড়ার জন্য ঢাকার নবাবের উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'। জিন্নাহ কৃষক প্রজা পার্টি এবং এই দলের মধ্যে সমঝোতা করে এগুলিকে মুসলিম লিগের আওতায় এনে নির্বাচনে লড়ার চেষ্টা করেন। তিনি ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি এবং তাঁর নেতৃবৃন্দ ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, শাহিদ সুরাওয়ার্দি, মৌলানা আক্রম খান, তামিজুদ্দিন খানদের মুসলিম লিগে শামিল করতে পারলেও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে শামিল করতে ব্যর্থ হন। মূলত লিগের জমিদার মুখীনতা এবং বাংলাভাষা বিরোধিতাই এর কারণ। ফজলুল হক বাঙ্গালি কৃষকদের 'ডাল-ভাতের' ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন নির্বাচনে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে কংগ্রেস সর্ববৃহৎ দল হিসেবে ৬০টি আসন পায় এবং মুসলিম লিগ ৪০টি আসনে জয়ী হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দল হিসেবে কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন, নির্দল মুসলমানরা পায় ৪১টি আসন আর নির্দল বর্ণহিন্দুরা পায় ১৪টি আসন। এই নির্বাচনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো ফজলুল হক পটুয়াখালী নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে সেখানকার জমিদার খাজা নাজিমুদ্দিনকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। এছাড়া, আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে কবি নজরুল ইসলাম নির্দল হিসেবে লড়েন এবং তাঁর জামানত জব্দ হয়।

নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৭ ও ১৮ মার্চ, ১৯৩৭-এ সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাঁরা যেসব রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেই সরকার গঠন করবে, তাছাড়া অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরা কোথাও সরকার গড়বে না। কংগ্রেস হাইকমান্ডের তরফে এই সিদ্ধান্ত ছিল 'হিমালয়সদৃশ ভুল'। এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে

আসার জন্য বাঙ্গলার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে হাইকমান্ডকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন থেকেই কংগ্রেসে হাইকমান্ডরাজ শুরু হয়ে গেছে! এই সময়ের ঘটনাক্রম একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বাঙ্গলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট সর্ববৃহৎ দলের নেতা হিসেবে কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসুকে মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য ডাকেন। কিন্তু তিনি হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক কংগ্রেসের বিধানসভার দলনেতা কিরণশঙ্কর রায়কে অনুরোধ করেন তাঁর নেতৃত্বে জোর মন্ত্রীসভায় যোগদান করতে। শরৎচন্দ্র বসু, যিনি কংগ্রেসের একটা অলিখিত গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বাঙ্গলার বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে মন্ত্রীসভায় যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। বলা হয়ে থাকে, এই প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসু রাজি ছিলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! মৌলনা আজাদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এমনকী, বিধানচন্দ্র রায়ও কংগ্রেস-কেপিপি জোট মন্ত্রীসভার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে কয়েক বছরের জন্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে থাকেন। পরবর্তীকালে যখন সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি হন তখন তাঁর ও মোহনদাস গান্ধীর মধ্যে যে চিঠি চালাচালি হয় তাতেও একথা প্রমাণিত। মূলত গান্ধী, আজাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লার আপত্তিতেই কংগ্রেস বাঙ্গলার মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই পদক্ষেপের ফলে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে যায় যা পরবর্তীকালে বাঙ্গলার তথা ভারতের রাজনীতি ও সমাজকে অন্ধকারের অতলে নিক্ষেপ করে। ফজলুল হক মুসলিম লিগের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হলেন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. নীতীশ সেনগুপ্ত তাঁর ''History of the Bengali Speaking People'-এ বলেছেন, ''In retrospect, there can be no doubt that the Congress's mistake in turning down Fazlul Huq's request in Bengal, together with its blunder in United Provinces, did pave the way for the partition of the subcontinent years later. The Muslim League took full advantage of its governmental authority in Bengal to extend its support bese over the Muslim masses.''

এই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সুভাষচন্দ্র বসু ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮-এর এক চিঠিতে মোহনদাস গান্ধীকে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও লেখেন, ''In the case of Bengal too, his (Moulana's) views are against mine. According to Moulana Saheb, Muslim ministries should be accepted where Muslims are in a majority even though those ministries should be accepted where Muslims are in a majority even though those ministries are blatantly communal.'' অসাম্প্রদায়িক মৌলানা আজাদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকা এক্ষেত্রে পরিষ্কার।

যাইহোক, এসবের ফলে কেপিপি ও কংগ্রেসের জোট মন্ত্রীসভা হলো না। ফজলুল হক লিগের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন এবং কেপিপি, লিগ, তফশিলি ও বর্ণহিন্দু এমএলএ-দের নিয়ে গঠিত হলো এক জোট মন্ত্রীসভা। এই সময়েই নির্দল হিসেবে নির্বাচিত এমএলএ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিরোধী নেতা হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে মন্ত্রীসভায় মুসলিম লিগ নানাভাবে হক সাহেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নানা টানাপোড়েনের পরে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর মুসলিম লিগ সদস্যরা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে, ফলে হক-লিগ মন্ত্রীসভার পতন হয়। অবশ্য অভিজ্ঞ হক সাহেব মুসলিম লিগের মনোভাব আঁচ করতে পেরে আগেই তৈরি হয়েই ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্তের কলকাতার বাসভাবনে ওই বছরের ২৭ নভেম্বর একটি গোপন বৈঠক করেন তিনি। মুসলিম লিগ বাদে বাকি সব রাজনৈতিক দলকে ডাকা হয় ওই বৈঠকে। উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র নস্কর, হাসেম আলি খান, শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ নেতা। ওই বৈঠকে স্থির হয় ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন' মন্ত্রীসভা গঠন করা হবে। বৈঠকের প্রস্তাবমতো হিন্দু মহাসভা নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হক সাহেবকে সভার প্রস্তাব জানিয়ে তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি প্রস্তাব স্বীকার করে ড. শ্যামাপ্রসাদকে অর্থ এবং শরৎচন্দ্র বসুকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গ্রহণের অনুরোধ করেন। সেখানে উপস্থিত সকলেই এতে সায় দিলেন। ৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সেইমতো ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর ৯ জন ক্যাবিটেন মন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করল। এই ৯ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪ জন ছিলেন হিন্দু সদস্য। এর মধ্যে ২ জন ফরোয়ার্ড ব্লকের, একজন তফশিলি জাতিভুক্ত এবং চতুর্থজন স্বয়ং হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। যে দুজন ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য জানিয়েই শপথ গ্রহণ করেন, যদিও তাঁদের দলের প্রতিষ্ঠাতা তখন জার্মানিতে অবস্থান করছেন। জার্মানি তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। অন্যদিকে, নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু জাপানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে মন্ত্রীসভা গঠনের ঠিক আগেই গ্রেপ্তার হন। শ্রীবসুর ওই মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার কথা ছিল।

যাইহোক, শপথ গ্রহণ করার পরেই ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, নতুন মন্ত্রীসভা হলো 'হিন্দু-মুসলমান' জোট মন্ত্রীসভা। নতুন এই জোট মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মন্ত্রীসভার বিরোধীরা বলতেন, ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদের তাঁবে থাকতেন। যদিও একথা

সত্য নয়। তবে শ্যামাপ্রসাদ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন। তিনি ফজলুল হকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন, মুসলিম লিগের তত্ত্ব বা আদর্শ হিন্দু স্বার্থবিরোধী। ফলে লিগের বাড়বাড়ন্ত হিন্দু স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি যে কোনো শর্তে মুসলমানদের সমর্থন নেওয়ারও বিরোধী ছিলেন। এবং গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সেটাই করছিল। সেই সময়ে বাঙ্গলার রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ''His position in Bengal politics at the time was akin to that of Chittaranjan and Subhas Chandra". (History of Modern Bengal, part-2). ড. মজুমদার অন্যত্র বলেছেন, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্য কয়েকজন ছাড়া গান্ধী প্রভাবিত কংগ্রেসকে থামানোর চেষ্টা কেউ করেনি, আবার ফজলুল হক ছাড়া জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগকে কেউ বাধা দেয়নি।

'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন' মন্ত্রীসভা যা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা হিসেবে সাধারণ্যে পরিচিত ছিল তা শপথ গ্রহণ করে ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। শপথ গ্রহণের দিনই শ্যামাপ্রসাদ 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''Bengal has shown today that inspite of internal differences, the important elements of our national life can combine for the good of the country." বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা গঠনকে 'হিন্দু-মুসলমান' ঐক্যের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। এই মন্ত্রীসভার কার্যকালে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি যা বাঙ্গলার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এর পরে তাঁর উদ্যোগে যৌথভাবে বাঙ্গলার কয়েকটি জেলায় ভ্রমণ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করেন। প্রধানমন্ত্রী (এখন মুখ্যমন্ত্রী) ফজলুল হক ঘোষণা করেন, শ্যামাপ্রসাদ মুসলমানদের ভালোমন্দ দেখবে এবং আমি দেখব হিন্দুদের ভালোমন্দ। শ্যামাপ্রসাদ ঢাকার করোনেশন পার্কের এক সমাবেশে (২১ এপ্রিল, ১৯৪২) বলেন, 'বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, সমস্ত মানুষের জন্য'। তিনি হক সাহেবকে ধন্যবাদ জানান সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পুরোপুরি ঐক্যের জন্য আবেদন জানান এবং হিন্দুদের কাছে আবেদন জানান মসজিদ রক্ষা করতে এবং মুসলমানদের কাছে আবেদন জানান গুন্ডাদের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের ও তাঁদের মন্দির রক্ষা করতে। ব্যক্তিগত স্তরেও শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম আর্থিক সঙ্কটে পড়লে তাঁকে অকাতরে সাহায্য করেছেন শ্যামাপ্রসাদ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ত্রাণ সমিতি গড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে ত্রাণ সাহায্য করেছেন। মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তিনি মুক্তহস্তে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। ফলে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে এই মন্ত্রীসভা শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পেয়েছে। আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যও এই মন্ত্রীসভা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু শুরু থেকেই মুসলিম লিগ ও বাঙ্গলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট এই সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে।

ইতিমধ্যে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার, নিপীড়ন শুরু করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ এর প্রতিবাদ করে জন হারবার্টকে এই অত্যাচার বন্ধ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে অত্যাচার আরও বাড়ানো হলো। শ্যামাপ্রসাদ সরকারের এই দমননীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল লিনলিথগো ও বাঙ্গলার গভর্নর জন হারবার্টকে লেখা চিঠিগুলো তাঁর স্বদেশপ্রেম ও দূরদর্শিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ ১৬ ডিসেম্বর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর। 'শামা-হক' মন্ত্রীসভা বাঙ্গলার রাজনীতিতে 'হিন্দু-মুসলমান' ঐক্যের প্রথম ও শেষ আন্তরিক প্রচেষ্টা। এ ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হক— দুজনেই ছিলেন আন্তরিক।

দু-জনের দু-জন সম্পর্কে মতামত উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের উপসংহার টানবো। শ্যামাপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উল্লেখ করে ফজলুল হক তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবুল মনসুর আহমেদকে বলেছিলেন, ''শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চিনো না। আমি চিনি। সে স্যার আশুতোষের ব্যাটা। করুক সে হিন্দু মহাসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁর মতো উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসেও একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমারে যদি বিশ্বাস করো তারেও বিশ্বাস করতে হবে।" জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার শেষ চেষ্টার অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন কাশ্মীরের কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে ফজলুল হক পূর্বপাকিস্তান থেকে তারবার্তা পাঠিয়ে তাতে বলেন, ''The loss of the only brother I had in this world had driven me mad with sorrow."

আর শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হক জন হারবার্টের চক্রান্তে পদত্যাগে বাধ্য হবার পরে বলেছিলেন, ''Mr. Fazul Huq had been ousted because he roused there of Civil Street and Governor by his independence. The fact that they, Hindus and Muslims had gathered on the same platform in pursuance of a common cause augured well to the future of the province." ■

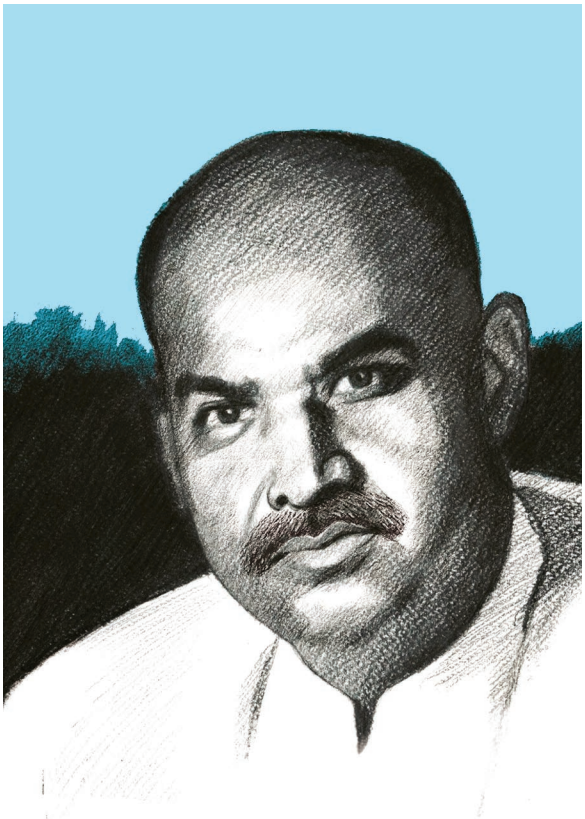

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

ড. জিষ্ণু বসু

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সকলে এক দৃঢ়চেতা, মানবদরদি, নিঃস্বার্থ দেশনায়ক হিসেবেই জানেন। তবে অনেকেই একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার জন্যও এই মহাপ্রাণের অনেক অবদান আছে। ইংরেজ শাসনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এদেশে বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। আজকের দিনের অনেক গবেষকই এই অত্যাশ্চর্য সাফল্যের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন। তবে কি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল নাকি ইউরোপীয় শাসকদের অসহনীয় অত্যাচার ভারতবাসীর মধ্যেকার সহজাত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত হতে দৃঢ়সংকল্প করে তুলেছিল? শ্যামাপ্রসাদের মতো ব্যক্তিত্বের বিষয়ে গবেষণা প্রকাশ্যে আসার পরে উত্তরোত্তর দ্বিতীয় মতটির পক্ষেই পাল্লা ভারী হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর বড়ো আর লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলির মধ্যে একটি হলো – সার্ন, দ্য ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ। ২০১২ সালে 'ঈশ্বর কণা' বা 'হিগস বোসন' পরীক্ষামূলক অবিষ্কারের সময় আরও একবার উঠে এসেছিল সার্নের নাম। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে সার্নের ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসের ঠিক সামনে আছে একটি বিরাট ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি। ১৯১৮ সালে শ্রীলঙ্কায় ভূতাত্ত্বিক আনন্দ কুমারস্বামী সর্বপ্রথম নটরাজের মহাজগতিক নৃত্যের সঙ্গে পদার্থের মধ্যেকার অবআণবিক কণার গতির সম্পর্কসূত্রের কথা বলেন। অনেক পরে আমেরিকার বিজ্ঞানী ও ভাষ্যকার এই মহাজাগতিক সম্পর্কের কথা বিশ্ববাসীকে জানান। সার্নের ওই নটরাজ মূর্তির নীচে আদি শঙ্করাচার্যের শিবানন্দ লহরীর একটি শ্লোক খোদিত আছে—

নিত্যায় ত্রিগুণাত্মনে পুরজিতে কত্যায়নীশ্রেয়সে
সত্যয়াদিকুটুম্বিনে মুনিমনঃ প্রত্যক্ষচিন্মূর্তয়ে।
মায়াসৃষ্ট জগদ্‌ত্রায়ায় সকলাম্নায়ান্তসংচারিণে
সায়ন্তাণ্ডবসম্ভ্রমায় জটিনে সেয়ং নতিঃ শম্ভবে।। ৫৬।।

"হে সর্বব্যাপী, সকল সৎগুণের মূর্ত প্রকাশ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারে আনন্দ তাণ্ডবরত হে নটরাজ, তোমাকে প্রণাম।"

জেনেভার সার্নের নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারের নটরাজ মূর্তি আর তার নীচের এই অপূর্ব শ্লোক ভারতবর্ষের কাছে একান্ত গর্বের বিষয়। আমাদের দেশের প্রজ্ঞাবান দার্শনিকেরা বিজ্ঞান মেধাকে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে প্রেরণা দিয়েছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষই দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংখ্যা ও বস্তুস্থিতি তাঁরা সঠিকভাবে জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। শল্য চিকিৎসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রাদি তৈরি করেছিলেন। কয়েক হাজার বৃক্ষ-লতা- গুল্মের ভেষজ গুণ নিপুণভাবে আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভারতীয় আয়ুর্বেদ গবেষকেরা। এসবই শত শত বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বদেশি জাগরণের অংশ ছিল। প্রাচীন ভারতের গৌরব আমাদের দেশের চিন্তাবিদদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঠিক তেমনই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের পরম্পরাগত উত্তরাধিকার নতুন যুগের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। যুব-বিজ্ঞানীরা বিশ্বসভায় তাঁদের সাফল্যকে দেশপ্রেমে নিজেদের নিবেদন বলে মনে করতেন। বিজ্ঞান গবেষণায় প্রাচীন ভারতের অবদান সে যুগের বিজ্ঞানীদের বিশেষ রূপে প্রভাবান্বিত করেছিল

বেটথেলু লিখেছেন, 'গ্রিক অ্যালকেমি', আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০২ সালে প্রকাশ করলেন 'হিন্দু কেমেস্ট্রি'র প্রথম খণ্ড। বিরাট

আলোড়ন ফেলল সেই গ্রন্থ। ১৯০৯ সালে আচার্য তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ। যুবক বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উন্নত স্বাধীন দেশের বিজ্ঞান গবেষকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে থাকলেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের এই সাফল্য স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চেয়েছিলেন কলকাতায় এমন একটি সংস্থা স্থাপন করতে যেখানে দেশের মানুষ বিজ্ঞান গবেষণা করবেন, স্বদেশি ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতির জন্য। ১৮৭৬ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। এই 'কালটিভেশন' শব্দটির চয়নও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বিজ্ঞানের 'কালটিভেশন' মানে চর্চা হবে, নাড়াচাড়া করা হবে। একজন সাধারণ মানুষ নিজেকে তৈরি করে, কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করবেন। কতকটা চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমনের মতো। দ্য ইন্ডিয়ান ফিনান্স সার্ভিসের একজন সদস্য যেমন এখানে এসে আলোকরশ্মির আণবিক বিচ্ছুরণের চর্চা করতে করতে 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কার করে ফেললেন। সেই তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটাই আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে একমাত্র বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে। সালটা ১৯২৩।

পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানের এই সাফল্যকে কোনোভাবেই 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য কোনো বড়ো বাজেটের 'ইম্পেরিয়াল প্ল্যান' ছিল না। বরং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনটাই এই জাগরণের কারণ হিসেবে ভাবা যায়। যার থেকে উঠে এসেছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। স্যার তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার জন্য সাঁইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সাত লক্ষ টাকা দান করার সময় স্যার তারকনাথ পালিতের বক্তব্যেও উঠে এল 'কালটিভেশন' শব্দটি। সেদিনের ভাষণ পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক 'পালিত প্রফেসর'-কে'প্রেরণা জুগিয়েছে, ''এই সামান্য অর্থ ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য। বিজ্ঞান চর্চা (কালটিভেশন) ও অগ্রগতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইল।''

সত্যি বলতে কী উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানীরা প্রেসিডেন্সি কলেজে অসামান্য কাজ করেছেন। আজ মোবাইল থেকে উপগ্রহ, রান্নাঘর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, সর্বত্র ব্যবহার হয় যে মাইক্রোওয়েভ তা আবিষ্কার করেছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞান গবেষণা পূর্ণরূপ পেল ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। এক ঝাঁক তারকা সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি ভি রমণ, গণেশ প্রসাদ আর শিশির কুমার মিত্রের মতো দিকপাল সব বিজ্ঞান শিক্ষকেরা 'রাজাবাজার সায়েন্স কলেজকে' সত্যিই 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' করে তুললেন। সেই সাধনার পূর্ণতা পেল ১৯১৫ ব্যাচের এমএসসি ছাত্রদের অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সেই নক্ষত্রমণ্ডলীতে

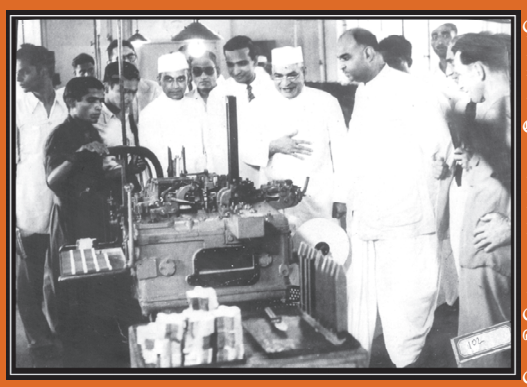

শিল্পমন্ত্রী হিসাবে ড. শ্যামাপ্রসাদ একটি কারখানা পরিদর্শন করছেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন দেশের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের শিল্পায়ন ও নতুন প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 'দ্য কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (সিএসআইআর) সংস্থার প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'দ্য ন্যাশেনাল কেমিকাল ল্যাবরেটরি', 'দ্য সিরামিক্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট', 'দ্য ফুয়েল রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'দ্য ন্যাশেনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরেটরি'— এই পাঁচটি সংস্থার পরিকাঠামো তৈরি করে কার্যান্বয়ন শুরু হয় তাঁর সময়েই। তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের কোর্ট মেম্বারদের একজন ছিলেন।

ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই বিজ্ঞান সাধনার উপবন যে মনোহর পুষ্পপল্লবে ভরে উঠেছিল তার নেপথ্যে ছিল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঘাম, রক্ত আর অশ্রুবিন্দু। অসামান্য শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ স্যার আশুতোষ পরপর চারবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে দুই বছর করে চারবার ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই পদ অলংকৃত করেছিলেন বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯২১ সালে আর একবার নির্বাচিত হন।

'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' স্থাপন করার পেছনে সবথেকে বড়ো অবদান ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। কালক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের এই ক্যাম্পাসটি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ নামে বেশি পরিচিতি লাভ করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা, গণিত ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় 'চেয়ার প্রফেসর' পদ তৈরি করে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতদের এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবথেকে কম বয়সের উপাচার্য হিসেবে এমন সব সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ কল্পনাও করতে পারতেন না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো কোনো প্রথাগত ডিগ্রি ছিল না। তবুও শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে 'ডিস্টিঙ্গুইস্ট প্রফেসর' পদে বাংলা বিভাগে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে ঘটালেন এক যুগান্তকারী ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ ভারতীয় ভাষাতে হলো।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের স্থাপনের মাধ্যমে যে মহাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ সেই অপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করায় মননিবেশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও ভারতের শিক্ষানীতির বিষয়ে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, ''যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ, মুক্তচিন্তা ও রাজনৈতিক সচেতনতা এনেছে, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের উপযোগী কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি আমি খুঁজে পাইনি।'' শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষার ভিত্তিকে ভারতকেন্দ্রিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট (আইএ) পরীক্ষায় পুরাতত্ত্বকে একটি বিষয় হিসেবে যুক্ত করা হলো। বিএসসি-র পাঠক্রমে জ্যোতির্বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ১৯৩৭ সালে এমবিএম পাঠক্রমকে ছয় বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের করা হলো। কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক বছর পিছিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ বিদ্যা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের নিত্যদিনের জীবনে তার প্রকৃত ব্যবহার হচ্ছে না। যে দেশে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র, রোগ-ব্যাধি আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আছেন, সেই দেশে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির জন্য, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পুষ্টির উন্নতিকল্পে, ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির জন্য ও মানুষের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'' বিশ্ববিদ্যালৈয়ের উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার পাঠক্রমে 'মাসস্কেল প্রোডাকশন' বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর সময়েই 'কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ শুরু হয়েছিল। স্নাতকোত্তরের বিষয় হিসাবে ফলিত মনোবিদ্যার পঠনপাঠন শুরু হয় তখনই। তিনি কৃষিবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সও শুরু করেন।

> স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এই কলকাতার মাটিতেই বিজ্ঞান গবেষণার সূবর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে বারুইপুরে আইএসিএসের যে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে, তা হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ উত্তরাধিকার।।

১৯৩৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস'। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কালটিভেশন অব সায়েন্সের সঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও কয়েকটি সংস্থা বিজ্ঞান গবেষণায় কলকাতার নাম উজ্জ্বল করেছে, তার মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, বোস ইন্সটিটিউট এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৮ সালটা কলকাতায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। সেবছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্স এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন একযোগে একটি বড়ো বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান মনীষীরা একত্রিত হয়েছিলেন সেই মহাসম্মেলনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, ''ভারতবাসী কেবল ভাববাদী, তাদের বস্তুনির্ভর বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান নেই, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র স্বপ্নই দেখেনি। ভারতের গৌরবময় দিনে, তাঁর বার্তাবহ দূতেরা দেশের সীমানার বাইরে গিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। চরক ও শুশ্রুত, নার্গার্জুন ও ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট ও লীলাবতী এমন আরও অনেকে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে...''।

সবশেষে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, ''ঐতিহ্য ও চিন্তায় সমৃদ্ধ, প্রতক্ষ্য প্রমাণ ও ক্ষমতায় বলশালী ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীর সঙ্গে উচ্চতর ও মহত্তর সভ্যতার পথে তালে তাল মিলিয়ে সমানভাবে চলতে পারবে।''

স্বাধীন ভারতবর্ষেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন দেশের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের শিল্পায়ন ও নতুন প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 'দ্য কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' (সিএসআইআর) সংস্থার প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'দ্য ন্যাশেনাল কেমিকাল ল্যাবরেটরি', 'দ্য সিরামিক্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট', 'দ্য ফুয়েল রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'দ্য ন্যাশেনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরেটরি'— এই পাঁচটি সংস্থার পরিকাঠামো তৈরি করে কার্যান্বয়ন শুরু হয় তাঁর সময়েই। তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের কোর্ট মেম্বারদের একজন ছিলেন।

বাঙ্গলার আকাশে সেদিন বিপদের ঘনঘটা, ১৯৪৬ সালে ঘটে গেছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। ১৯৪৭ সালের শুরুতে রব উঠল সমগ্র বঙ্গপ্রদেশই পাকিস্তানকে দেওয়া হবে। তেমনই দাবি মুসলিম লিগের। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তো লিগের সঙ্গেই প্রথম থেকে ছিল। অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানে যাওয়ার প্রস্তাব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের নবজাগরণের কেন্দ্রই তো ছিল বঙ্গপ্রদেশ। স্বাভাবিক ভাবেই তা ভারতবর্ষেই থাকার কথা। সেই সময় ড. শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়েছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতো অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য, সংগঠনগত পার্থক্য, দল-মত সব কিছু ভুলে বাঙ্গলার জন্য লড়েছিলেন কলকাতার এই প্রকৃত বিদ্বজ্জনেরা। এনাদের সম্মিলিত লড়াইয়ের জয় হলো। ২০ জুন, ১৯৪৭ বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ আইনসভা গঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের রাজ্য হিসেবে থেকে গেল। সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও। যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই জ্বলে উঠেছিল এই উপমহাদেশের প্রথম আলো।

১৯৩৯ সালে নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পাঠক্রমে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। অধ্যাপক সাহা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত প্রফেসর'। ইতিমধ্যে তিনি লরেন্স কার্কলে ন্যাশেনাল ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তখন অ্যাসিলারেটর ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন একটা যন্ত্রের জন্য প্রয়োজন অনেক টাকা আর সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গাও। তাই তাঁর স্বপ্ন সাকার হওয়ার পথে অনেক বাধা এসে দাঁড়াল। কিন্তু অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— সরস্বতীর এই দুই বরপুত্রের মিলিত প্রয়াসের সামনে কোনো বাধাই আর টিকল না।

১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (আজকের সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) সংস্থার উদ্বোধন করলেন ড. শ্যামাপ্রসদ মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে ড. মুখার্জির ভাষণে নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার বিষয়ে তাঁর ভাবনা ও স্বপ্ন ফুটে উঠেছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদের সেদিনের ভাষণ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে আজকের বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষকেরা তাঁদের চলার পথের পরিষ্কার দিকনির্দেশ পাবেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স তাদের বারুইপুর ক্যাম্পাসে, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (স্মার্ট) শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই রকম গঠনমূলক সময়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত আলোকবর্তিকা ভীষণভাবে কার্যকর হয়ে উঠবে।

''...পারমাণবিক যুগের এই প্রভাতে, আমাদের অবস্থা কতকটা সেই মানুষটির মতো, যে সর্বপ্রথম আগুন জ্বালাতে পেরেছিল। সেই আগুন রান্নার কাজে, উষ্ণতার জন্য বা আলোর উৎস হিসাবে কাজে লেগেছে, খুব বিরল পরিস্থিতিতে শত্রুকে বা তার সম্পত্তি পোড়ানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল সে ভাবতেও পারত না যে, একদিন সেই আগুনে স্টিম ইঞ্জিন চলবে, রেলগাড়ি চলবে, টারবাইন ঘুরবে, সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ব্যবস্থা হবে। প্রথম আগুন আবিষ্কারের পর থেকে বৃহত্তর ভাবে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়ার মাঝখানে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে...। ...আমি আনন্দিত যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক পরমাণু গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য একটি পুরদস্তুর 'ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' স্থাপন করার মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পেরেছে।''

মজার বিষয় হলো, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পিতামহ গঙ্গাধর মুখার্জি ছিলেন ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের সুহৃদ। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের শুরুর সময়ে অঙ্কের ক্লাস নিতেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেও কালটিভেশনের গভর্নিং কাউন্সিলের (তখন ম্যানেজিং কমিটি বলা হতো) সদস্য ছিলেন। তাই কালটিভেশন অব সায়েন্সের সঙ্গে বহুভাবে জড়িয়ে আছে ড. শ্যামাপ্রসাদের নাম।

২০২০ সাল তো বহু কারণেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। হতেও পারে এই বছরটা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (স্মার্ট) ক্যাম্পাসের পরিকাঠামো তৈরির জন্যও বিখ্যাত হয়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত ওই সংস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এই কলকাতার মাটিতেই বিজ্ঞান গবেষণার সুবর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে বারুইপুরে আইএসিএসের যে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে, তা হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ উত্তরাধিকার।

বঙ্গ ভাগ নয়, পাকিস্তান ভাগ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এক অনন্য ইতিহাস

বিমল শংকর নন্দ

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক বিকাশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সহস্রাব্দপ্রাচীন। সেই ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের শরিক বাংলাভাষী সকল মানুষ যারা তাদের সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনে তাকে রক্ষা করতে চায়। তবে সাংস্কৃতিক বিকাশের পাশাপাশি সমাজবিন্যাস এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের দিকটিকেও অবহেলা করা যায় না। বরং এগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করতেন 'সমাজ বিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস'। জাতিসত্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতি সবকিছুই সমাজ ও রাজনীতির বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজবিন্যাস ও রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাসের পথ ধরে প্রাচীন বঙ্গদেশ মুঘল আমলে 'সুবা বাঙ্গলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে হয় বেঙ্গল বা বাঙ্গলা নামে একটি প্রদেশ। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন সেই বেঙ্গল থেকে জন্ম নেয় ওয়েস্টবেঙ্গল বা পশ্চিমবঙ্গ । ১৯৪৭ সালের এই দিনই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যগণ ৫৮–২১ ভোটে বঙ্গভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। সৃষ্টি হলো পশ্চিমবঙ্গ, হলো ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল হিন্দু বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী, বেঁচে গেল এথনিক ক্লিনজিং-এর হাত থেকে।

কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গ গঠনের এই ইতিহাসকে বহুদিন ধরে তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়নি, স্মরণ করা হয়নি যাঁর দূরদর্শিতা এবং হার-না-মানা লড়াইয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গঠন সম্ভব হলো সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বরং একশ্রেণীর বাম-উদারবাদী ইতিহাসলেখক এবং একই মতাবলম্বী রাজনীতি ব্যবসায়ী এখনো শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে শ্যামাপ্রসাদই বাঙ্গলাভাগের জন্য দায়ী। এই ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন ঘটে বাম-উদারবাদী গোষ্ঠীর কিছু লেখকের লেখা গ্রন্থে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তপন রায়চৌধুরীর 'বাঙালনামা', জয়া চ্যাটার্জির Bengal Divided : Hindu Communalison and Partition, 1932–1947', সুনীতি কুমার ঘোষের 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি' প্রভৃতি। তালিকা আরও বাড়তে পারে। এদের কেউ কেউ মনে করেন বাঙ্গলার রাজনীতির সাম্প্রদায়িকরণ হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের কারণে। আর শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় যদি বাঙ্গলাভাগ না হতো অর্থাৎ শরৎ বসু-কিরণশংকর রায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী বাঙ্গলা যদি স্বাধীন সার্বভৌম হতো তবে বিশ্বব্যবস্থায় বাঙ্গলা নাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকতে পারতো।

সত্যিটা হলো কেবল বাঙ্গলা নয়, শ্যামাপ্রসাদ প্রবলভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে ভারতভাগ আটকানো যায়। যখন ভারতভাগ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠলো তখন বাঙ্গলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছিলেন এবং তার ও তৎকালীন বাঙ্গলার জাগ্রত মনীষার এক বড় অংশের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা এবং জনগণের দাবিতে সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বাস্তববাদী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন তথাকথিত স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙ্গলা আসলে পাকিস্তানের অংশ হবে এবং হিন্দু বাঙ্গালিকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ তাই বাঙ্গলা নয়,

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনায় দিল্লিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৯)।

আসলে পাকিস্তানকেই ভাগ করেছিলেন। অখণ্ড বঙ্গের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদে বলীয়ান এক শক্তিশালী পাকিস্তানের যে স্বপ্ন জিন্না দেখেছিলেন তা বাস্তবে সত্যি হতে দেননি শ্যামাপ্রসাদ। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে সেই সত্যিটাকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো।

বর্ণান্ধ বাম-উদারবাদী ইতিহাস লেখকগণ বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রাবল্যের জন্য শ্যামাপ্রসাদ, হিন্দু মহাসভা কিংবা সামগ্রিকভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে যতই দায়ী করুন, বাস্তব সত্য হলো সাম্প্রদায়িকতার চারাগাছটি রোপণ করা হয়েছিল ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে। ওইদিন প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলিগড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৃথক মুসলিম জাতিসত্তার সে ভাবনাকে লালন পালন করা শুরু হয় তার সাংগঠনিক প্রকাশ ঘটেছিল মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। লিগের ভেতরে এবং বাইরে অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তার বদলে মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তার ভাবনাকে শক্তিশালী করা হতে থাকে। তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে উদারপন্থী জিন্নাও ধর্মের ভিত্তিকে জাতিসত্তা নির্ধারণের ভাবনাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু ১৯১৯-২০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করার পর জিন্নাও ৩০-এর দশক থেকে পৃথক মুসলিম জাতিসত্তার ভাবনাকে মুসলমান জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং জনপ্রিয় করার কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ সম্মেলনে স্যার আল্লামা মহম্মদ ইকবালের সভাপতির ভাষণে পৃথক মুসলিম জাতিসত্তাকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পৃথক জাতিসত্তার ভাবনা পৃথক দেশের রূপ পায় ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে। ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ, মুসলিম লিগ মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক দেশের দাবি তুলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাংশে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলির ভৌগলিক সীমা চিহ্নিত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা হয়।

লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে কী হতে চলেছে তা অনুমান করতে পেরেছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদ। বিশেষত এই দাবিকে সামনে রেখে বাঙ্গলার রাজনীতিতে কী কাণ্ড ঘটাতে পারে মুসলিম লিগ, সে ব্যাপারেও শ্যামাপ্রসাদের মনে

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত (বনগাঁ) পরিদর্শনে শ্যামাপ্রসাদ, সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি (১৯৫০)।

গভীর উদ্বেগ ছিল। তাঁর চিন্তা এবং উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় লাহোর প্রস্তাবের ঠিক ১৩ দিন পরে সুরমা ভ্যালি এবং শিলং হিল ডিস্ট্রিক্ট হিন্দু কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণে। ১৯৪০ সালের ৬–৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''আমাদের সামনে বিপদ এখন অনেক। শেষতম বিপদটি হলো পাকিস্তানের দাবিতে আন্দোলন যাকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। যারা হিন্দুস্থানকে ভালোবাসে তাদের সকলের কাজ হলো এই অযৌক্তিক দাবিকে অঙ্কুরেই বিসর্জন করা।''

ভারতে কংগ্রেস রাজনীতির চরিত্র সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। মুসলিম লিগের এই দাবির মোকাবিলা কংগ্রেস কতখানি করতে পারবে সে ব্যানারে তাঁর সন্দেহ ছিল। ওই অধিবেশনেই কংগ্রেসকে সতর্ক করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ''বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজের ছত্রছায়ায় এনে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি গঠনের যে নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল তা এমন কোনো সাফল্যের মুখ দেখেনি যে আমাদের হৃদয় আনন্দ এবং আশাবাদে পূর্ণ হবে। বরং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে যে আমরা অন্যান্য সম্প্রদায়কে তুষ্ট রাখতে হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থকে যতই জলাঞ্জলি দিই না কেন, যতই আমরা তাদের ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়ার নীতি গ্রহণ করি না কেন, অন্য পক্ষের প্রতিক্রিয়াকে যদি শত্রুতাপূর্ণ নাও বলি তা বড়োই ধীরগতির কিংবা একেবারে স্তব্ধ।''

তৎকালীন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম লিগের দাবি পর্যালোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে, লিগ এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে তাদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি আদায় করে নিতে চাইছে। আর এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুসলিম লিগ ভারতীয় মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। লিগের ভারতভাগের দাবি প্রতিহত করতে শ্যামাপ্রসাদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নিলেন। প্রথমত, ভারতভাগ প্রতিরোধ করতে সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দু সমাজই কেবল সংগঠিতভাবে ভারতভাগ রুখে দিতে পারে। ১৯৪০ সালের ১৪ এপ্রিল নবম বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আমরা হিন্দুরা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যের স্বার্থে আমাদের অনেক ন্যায্য স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু তাদের সমর্থন লাভ করতে আমাদের আগ্রহকে আমাদের দুর্বলতা এবং অসহায়তা বলে ভুল ভাবা হয়েছে।'' শ্যামাপ্রসাদের নীতি ছিল হিন্দুরা আর কোনভাবে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। মুসলমানদের সমর্থন লাভের আশা ত্যাগ করে এবার নিজেদের হাতে হাত মেলাতে হবে। একই সঙ্গে পৃথক পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লিগের দাবির বিরোধিতা করতে হবে কারণ এই দাবি মেনে নিলে গোটা হিন্দু সমাজ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যদি হিন্দু সমাজ সমস্ত বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়। এটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এর

প্রতিফলন দেখা যায় ওই সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতায়। তিনি বলেছিলেন, ''ইসলামে ঐক্য এবং সমতার নীতি আছে যা হিন্দু ধর্মে নেই। জাতি, বর্ণ, ধর্মের পার্থক্য একজন হিন্দুকে অপর হিন্দুর প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে বাধা দেয়। অন্যদিকে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি তাঁর টান অনুভব করে। যদি সে মুসলমান ভারতের অন্য কোনো অংশে কিংবা পৃথিবীর যে কোনো অংশে বাস করে তবু এই টান বজায় থাকে। এই নীতির আরও প্রকাশ ঘটে ১৯৪০ সালের ৭ ডিসেম্বর মহাকোশল প্রাদেশিক হিন্দু সভার সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ প্রদত্ত ভাষণে। এই ভাষণে তিনি বলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে গেলে তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে দূর করতে হবে। ''রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব হবে না যদি না আমরা আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলিকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে পারি ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যাতে হিন্দুদের সমস্ত অংশের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা নিশ্চিত হয়।'' শ্যামাপ্রসাদের তৃতীয় নীতিটির মধ্যে তার রাজনৈতিক বাস্তববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদের প্রগতিশীল অংশকে কাছে টানার জন্য ১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে যে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ সেই মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়ে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের মূল লক্ষ্যই ছিল তীব্র হিন্দু বিরোধী এবং আগ্রাসী রাজনীতির ধারক ও বাহক মুসলিম লিগকে রাজনীতির ক্ষমতাবৃত্ত থেকে দূরে রাখা। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক ছিলেন তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী মুসলমান। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বও মানতেন না। শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন বাঙ্গলার রাজনীতির ভরকেন্দ্র থেকে মুসলিম লিগকে দূরে রাখার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলার প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের পর। এই নির্বাচনের পর ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে যদি হক-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা তৈরি হতো তবে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের গুরুত্ব অবশ্যই কমে যেত। কিন্তু কংগ্রেসের দোদুল্যমান্যতা এবং অন্তঃকলহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফজলুল হক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙ্গলাভাগের বিরোধী ছিলেন। বাঙ্গলার রাজনীতির এই বাস্তবতা কংগ্রেস যদি বুঝতো তবে আজ হয়তো অন্য পরিস্থিতি থাকতো।

লাহোর প্রস্তাবের কী ভয়ংকর প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে পড়তে চলেছে কংগ্রেস তা সঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। যদি পারতো তবে সর্বশক্তি এর বিরোধিতা করতে পাশে থাকতো। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হরিজন পত্রিকার এক নিবন্ধে গান্ধীর গলায় স্পষ্টতই অসহায়তার সুর দেখা গেল। গান্ধী লিখলেন, ''দেশকে টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্তের আমি শরিক হতে পারি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু ও মুসলমানরা যে এক জাতি হিসেবে বাস করেছে তা এর ফলে এক লহমায় নষ্ট হয়ে যাবে।'' কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও বললেন, ''আমরা এখন একটি যৌথ পরিবার। কেউ একজন পৃথক হতে চাইতেন পারে..... ভারতের মুসলমানরা যদি দেশভাগের দাবি নিয়ে জোর করতে থাকে অহিংসার পূজারি হিসেবে, আমি জোর করে তা আটকাতে পরি না।'' এদিকে ১৯৪০-৪১ সালে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হলো। নোয়াখালি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এই দাঙ্গার ভয়াবহতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বাঙ্গলার প্রাদেশিক সরকারে একটি বড়ো অংশই ছিল মুসলিম লিগ। ফলে এই দাঙ্গাগুলোতে সরকার প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ইতিমধ্যেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। একটি হলো ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব এবং হলো চক্রবর্তী রাজাগোপলাচারি প্রদত্ত রাজাজী ফরমুলা। দুটিতেই প্রকারান্তরে ভারতভাগ মেনে নেওয়া হলো। ক্রিপস প্রস্তাবের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক ছিল যদি কোনো প্রদেশ বা একাধিক প্রদেশ নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে রাজি না হয় তবে তারা নিজেদের গণপরিষদ গঠন করে সংবিধান রচনা করবে। আর ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল মাদ্রাজ প্রাদেশিক আইনসভায় রাজাজী যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তার মূল ভাবনা ছিল বিশ্বসুদ্ধ পেয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে গণভোটের ব্যবস্থা করা। এই গণভোটেই ঠিক হবে এই অঞ্চলগুলো ভারতে থাকবে না ভারতের বাইরে গিয়ে পাকিস্তান গঠন করবে।

বাঙ্গলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিপস প্রস্তাব এবং রাজাজী ফরমুলা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা বাঙ্গলায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই সময় ব্রিটিশ সরকারের গোপন রিপোর্ট বলে বাঙ্গলায় কংগ্রেস দল ক্রমেই জনপ্রিয় হারাচ্ছে এবং শ্যামাপ্রসাদের কারণে জনসমর্থন বাড়িয়ে চলেছে হিন্দু মহাসভা। ১৯৪৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ দিল্লিতে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু ক্রিপস প্রস্তাবের পর জিন্না তখন পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন, ''আমি জিন্নার কাছে পাকিস্তান ধারণা অযৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেক যুক্তি তুলে ধরেছি। কিন্তু তাকে প্রভাবিত করতে পারিনি। সেই সময় বিভিন্ন সভায় মুসলিম লিগের দাবির কাছে কংগ্রেসের অসহায় আত্মসমর্পণকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেন।

১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল শ্যামাপ্রসাদের ভাবনায় পরিবর্তন আনে। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ লড়েছিল পাকিস্তানের দাবিকে সামনে রেখে আর হিন্দু মহসভার দাবি ছিল অখণ্ড ভারত। এই নির্বাচনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে লিগ বিপুল ভোট পেয়ে জয়ী হয়। সার্বিকভাবে কংগ্রেসও ভালো ফল করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা নির্বাচনে ভালো ফল করেনি। ইতিমধ্যে পুনা প্রস্তাবে কংগ্রেসও ভারত ভাগের দাবি মেনে নেয়। ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশনও তার ভারতভাগে সম্মতি নেয়। শ্যামাপ্রসাদের সামনে তখন সবচেয়ে বড়ো চিন্তার বিষয় ছিল বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ। বাঙ্গলায় লিগের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট হয় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার বীভৎস রূপ দেখা গেল ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে। গণপরিষদ গঠন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে যখন কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ চলছে তখন ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতৈক্য না হয় তবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালে জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এই ঘোষণায় আরও বলা হলো ব্রিটিশ সরকার ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রাদেশিক সরকারের হাতে

বনগাঁয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থী শিবিরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৯)।

ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কিনা। এই ঘোষণায় খুবই আশান্বিত হয়েছিলেন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি। তাঁর আশা ছিল গোটা বাঙ্গলার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই থাকবে। অদ্ভুতভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গলার দাবিকে সমর্থন করে বসলেন শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায়। শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন সুরাবর্দির স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গলার স্বপ্ন যদি সফল হয় তবে হিন্দু সমাজের পক্ষে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। বাঙ্গলার লিগ সরকারের হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপের স্মৃতি তখনো সবার মনে টাটকা। বিশেষত ১৯৪৬-এর ১৬-ই আগস্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সুরাবর্দি এবং তাঁর দল মুসলিম লিগের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করেছিল। অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৪৫ শতাংশ। ফলে বাঙ্গলার রাজনীতিতে হিন্দুরা কখনোই নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ''ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গভাগ জাতীয়তাবাদের মূল নীতির বিরোধী। হিন্দুরা ভারতবর্ষ বা তার কোনো অংশকে ভাগ করতে চায় না। কিন্তু তারা (হিন্দুরা) যদি দেখে গোটা বঙ্গপ্রদেশ একদল উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক মানুষের হাতে চলে গেছে এবং ৪৫ শতাংশ মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হতে চলেছে, কারণ তারা একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ, তাহলে নিজেদের জন্য ভূখণ্ড দাবি করা অপরাধ নয়। সে ভূখণ্ডে তারা বসবাস করবে স্বাধীন ভাবে, যেখানে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজেদের সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করতে পারবে।

শ্যামাপ্রসাদ এটা ভালোই জানতেন সুরাবর্দি যতই স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানের স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখান, তিনি আসলে জিন্নার হাতের পুতুল। ১৯৪৭-এর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষ্যে সুরাবর্দি বলেছিলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি পাকিস্তান দিনের আলো দেখবে এবং পরের বছর পাকিস্তান দিবস পালনের কোনো প্রয়োজন হবে না'। এর প্রমাণ মেলে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের তৎকালীন সভাপতি আক্রম খানের কথাতেও। তিনি বলেছিলেন, ''পাকিস্তানের বাইরে পৃথক স্বাধীন বাঙ্গলার প্রশ্নই আসে না....আমরা একটি পৃথক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যার মধ্যে থাকবে সমস্ত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।'' কুশলী রাজনীতিবিদ জিন্নার স্বপ্ন ছিল গোটা বাঙ্গলা ও অসমকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা। আসামের চা-শিল্প, বাংলার পূর্ববঙ্গের কৃষি উৎপাদন আর পশ্চিমাংশের শিল্প ও খনিজ দ্রব্য পাকিস্তানের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবে। ভারতের প্রাচীনতম বন্দর কলকাতার উপর নির্ভরশীল নেপাল, ভুটান কিংবা সিকিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এইভাবে পাকিস্তান হয়ে উঠবে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক প্রবল পরাক্রমশালী দেশ। জিন্নার স্বপ্ন সত্যি হলে পাকিস্তান সত্যিই এক পরাক্রমশালী দেশে পরিণত হতো। কিন্তু তা হতে দেননি শ্যামাপ্রসাদ, তাঁর সহযোগী ছিলেন বাঙ্গলার জাগ্রত মনীষা এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালের ৪—৬ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর সম্মেলনে বাঙ্গলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জোরালো দাবি তোলা হলো। সেই সময় বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকা বঙ্গ ভাগ নিয়ে যে জনমত সমীক্ষা চালিয়েছিল তাকে ৯৮.৩ শতাংশ পাঠকই বঙ্গভাগের পক্ষে রায় দেন। শ্যামাপ্রসাদ ঝড়ের বেগে গোটা বঙ্গ চষে বেড়ালেন বঙ্গভাগের দাবি নিয়ে। সর্বত্রই হিন্দু সমাজের ব্যাপক সাড়া পেলেন। বঙ্গভাগের দাবি তুললেন স্যার যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাঙ্গলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস পঞ্জাব ও বঙ্গভাগের দাবি সমর্থন করলো। ব্রিটিশ সরকারও এই দাবি মানলো। জিন্না রাজী হলেন পোকায় খাওয়া খাওয়া পাকিস্তান মেনে নিতে।

সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলাভাগ করেছিলেন এই বক্তব্য ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তান ভাগ করেছিলেন। প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক যিনি, তিনি অনেক দূরের সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। চল্লিশের দশকে বঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে শ্যামাপ্রসাদ সেই অনুযায়ী তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাই একজন সত্যিকারের রাষ্ট্রনায়ক।

তথ্যসূত্র ঃ ১) নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালির ইতিহাস–আদি পর্ব।

২) দীনেশচন্দ্র সেন—শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ

৩) Nabkumar Adak–Shyamaprasad Mukherjee : A Study of His Role in Bengal Politics (1929–1953)

অতিথি কলম

চীনের আধিপত্যকে ধ্বংস করতে ভারতের মানসিক ও পেশীশক্তি দুটোই দরকার

স্বপন দাশগুপ্ত

সম্প্রতি লাদাখ অঞ্চলে চীন-ভারতের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেশের মধ্যে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। কোভিড মহামারী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা দেশের মনঃসংযোগ সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও সীমান্তের এই ঘটনা নতুন রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করেছে। চীনের এই আগ্রাসী নীতি ও পেছনে আরও বড়ো কোনো মতলবকে আন্দাজ করে নিয়ে দেশব্যাপী চীনাপণ্য, পরিষেবা, এমনকী বিনিয়োগকেও বর্জন করার আওয়াজ উঠেছে। এই সূত্রে ১৯৬২ সালের দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধে ভারতের পক্ষে চরম অবমাননাকর ফলাফল ও 'আকসাই-চীন' অঞ্চল হারানোর কথা সকলেই জানেন। এই অপমানের স্মৃতি জাতিকে ব্যথিত করলেও আজকের ভারত বিশ্বাস করে চীনের চোখে চোখ রেখে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার আছে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, জাতির এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাব কোনোভাবেই সমরাঙ্গনে সরাসরি পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু এতে বিপদের আশঙ্কাকে কোনোমতেই খাটো করে দেখা যাবে না। কেননা ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে যে বহু জটিল ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত হিসেবকে ব্যর্থ করে মানুষের বিচিত্র আবেগের বিস্ফোরণ পরিকল্পনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে চীন ও ভারতের মতো দুটি প্রতিবেশী সভ্যতার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ার সম্পর্কটি সূক্ষ্ম সূতোর ওপর ঝোলে। অবশ্যই ইতিহাস ও কূটনীতিবিদরা কলসির তলা অবধি গভীর অনুসন্ধান করে উভয় দেশের পারস্পরিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের অনুসন্ধান ও মিল খোঁজায় ত্রুটি রাখবেন না। কিন্তু দুটি নিশ্চিত উপসংহারের প্রসঙ্গ তাঁরা কিছুতেই এড়াতেও পারবেন না।

প্রথমটি হলো আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারত-চীন বিশেষজ্ঞ প্রবোধ চন্দ্র বাগচীর পর্যবেক্ষণ। তিনি বলেছিলেন, ভারত চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মূলত এক পক্ষীয় একটি প্রক্রিয়া। যে কারণে ভারতীয় চিন্তন ও জীবনধারার ওপর চীনা সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে কোনোদিনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়নি। দ্বিতীয়ত, হিমালয়ের দ্বারা সংযোজিত এই দুটি দেশের মধ্যে তিব্বত একটি কেন্দ্রীভূত অবস্থানে রয়েছে। অথচ এই তিব্বতীয় সংস্কৃতির কোনো প্রভাব 'হান সম্প্রদায়' পরিচালিত চীনে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণ প্রভাবহীন। তাই নিশ্চিত করেই তিনি বলেছেন ভারতীয় সভ্যতা কোনোদিনই চীনের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর ফলে কোনো প্রভাবের অস্তিত্ব অবান্তর।

একটা সময়ে হিন্দি মূলধারার সিনেমায় খুব বিখ্যাত হয়ে পড়া নর্তকী হেলেনের 'মেরা নাম চীন চীন চু' বা হোটেল রেঁস্তোরার ফেবারিট চীনে খাবার (যা আদৌ মূল চীনা পদ্ধতিতে রান্না করা নয়) খাওয়ার ফলে যথেষ্ট চীনা সংস্কৃতি আত্মীকরণ হয়েছে এটি নিতান্তই মানসিকতা ছাড়া কিছু নয়।

বিগত তিন দশক ধরে চীন একদিকে ক্ষমতার নরম কূটনৈতিক ব্যবহার (soft power diplomacy) , অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বাজার দখল করার লক্ষ্যে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। আজকের সারা বিশ্বের কাছে তারা নিজেদের একটি আত্মবিশ্বাসী ও অত্যাধুনিক দেশ হিসেবে পাশ্চাত্য দুনিয়ার ওপর চিরাচরিত প্রাধান্যকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাধারী হিসেবেই তুলে ধরেছে। দুঃখের বিষয়, এই ভাবমূর্তিটা ভারতীয় মানসেও আংশিকভাবে জায়গা করে নিয়েছে। তুলনামূলকভাবে সস্তায় কুশলী ও সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতায় নির্মিত ভোগ্যপণ্যগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও জনমানসে দীর্ঘ ঝুলন্ত গোঁফধারী,. রঙিন রেশমের বড়ো বড়ো জোব্বাপরা এক ধরনের কুচক্রী 'ড. ফু মানচু'র সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন ইমেজও কিন্তু রয়েছে।

এরই বিপরীত মেরুতে চীনের ম্যান্ডারিন

ভাষায় দুরস্ত ভারতীয় কূটনীতিকরা চৈনিক ভাষা চর্চা ও চীনা কৃষ্টি, ইতিহাস, সংস্কৃতির ওপর গবেষণা বা পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা গুলিয়ে ফেলেছেন। চীনেও কিন্তু ভারত সম্পর্কে ধারণায় এমন কিছু রকমফের নেই। সেটিও আদৌ সন্তোষজনক নয়। চীনের কাছে পাশ্চাত্য শক্তির দ্বারা দীর্ঘ নিপীড়ন, জাপানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বা বহুকাল ধরে বিশ্বের নানা দাপুটে শক্তির কাছে 'কুলি' নামধারী হয়ে পদাঘাত খেতে অভ্যস্ত চীনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী অপমানবোধ তৈরি করে। এই সমস্ত বিদেশি দৈত্যদের শিক্ষা দিতেই চীন তার গৌরব পুনরাদ্ধারের বদ্ধ পরিকর। এই গৌরব ইতিহাসে মিডিল কিংডোম-এর সময়কার। সেটায় পরে আসছি। এই অত্যাচারিত হওয়ার করুণ গল্প প্রচারের পেছনে ভারত যে পাশ্চাত্য শক্তির অনুগত ভূমিকাই পালন করছে এমন একটা ভাবনাই চীনে প্রচলিত আছে। চীনা জনমানসে ভারতীয়দের সম্পর্কে সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক বসতির অঞ্চলে ঢুকতেই বিশালদেহী পাহারাদার হিসেবে যে শিখদের দেখা যায় সেই রূপ কল্পনাটা চীনাদের কিছুটা ভীত করে। এরাই সেই বিদেশি বসবাসী অঞ্চলের প্রথম প্রতিরক্ষা প্রহরীর ভূমিকা নেয়। এদের হাতে যাকে মজবুত লাঠি, যে কোনো মুহূর্তে স্থানীয় চীনে রিকশাচালক বেয়াদপি করলে এরা রেয়াত করে না। এই ছবিটাই চীনের সাধারণ মানুষের ভারত সম্পর্কে ইতিহাস চেতনায় সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

ইতিহাসবিদ ইসাবেলা জ্যাকসনের এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, চীনা ইতিহাস বইয়ে-তে এই ধরনের ভারতীয় শিখদের বোঝাতে অত্যন্ত জঘন্য গালিগালাজ ব্যবহার করা হয়। চীনারা এদের বলে 'হংটু আসান' যার অর্থ বহুবিধ যেমন— লাল মাথা বাঁদর, লাল মাথা র‍্যাসকেল ইত্যাদি। এই সব নোংরা অভিধার সবটা বোঝানোর চেষ্টা হয় যে এরা পূর্বতন ব্রিটিশ প্রভুদের পা-চাটা চাকর ছাড়া কিছুই নয়।

এটা বেশ বোঝা যায়, এই মানসিকতা এক সময় মাও-জে-দংও তুলনামূলকভাবে বেশি পরিশীলিত চৌ এন লাইয়ের জওহরলাল নেহরুর ঔদ্ধত্য ও আচার আচরণের প্রতি বিরাগের মূল কারণ ছিল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ৬০-এর দশকে বিশ্ব আঙিনায় ভারতের স্থান ঠিক কী ছিল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকেই ৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ। পর্যদুস্ত হয়েছিল ভারত। এর পেছনে উল্লেখিত দুই ব্যক্তির অবদান কম নয়।

এবারেও শোনা যাচ্ছে, সেই ধরনের কোনো মানসিকতা চীনা রাজনৈতিক তথা পার্টি নেতৃত্বের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। মধ্য রাজত্ব বা ইতিহাসে মিডিল কিংডোম বলতে চীন বোঝায় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বছরের সময়কে। যখনকার চীনারা মনে করত তাদের সাম্রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থান করছে, বাকি অঞ্চলে অসভ্যদের বাস। পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্তিত্বই তারা জানত না। আর সেই সময়কার ভৌগোলিক অধিকারে থাকা সমস্ত অঞ্চলকেই এখনও তারা নিজেদের পতাকার অধীনে থাকা ভূখণ্ড বলেই অধিপত্য কায়েম রাখতে উদগ্রীব। চীনে যেহেতু সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয় তা সকলের বোধগম্য নয় এবং গোচরেও আনা হয় না, যে কারণে তাদের মনে কী আছে তা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ, যাকে বলে specelation। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বেজিং মনে করে বিশ্বজোড়া করোনা মহামারীর প্রকোপের সময় ভারতের পক্ষে বিশ্ব সমর্থন বিশেষ জোরদার হবে না।

চীনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা ভারতের যতটা ক্ষতি করতে পারে ভারতের পক্ষে চীনের ওপর তেমন ধাক্কা দেওয়া অসম্ভব। এই ভাবনাই তাদের অধৈর্য করে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে বাধ্য করছে। তাদের এই ধারণাকে ভেঙে দিতে দরকার আমাদের তরফে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, একই সঙ্গে বর্ধিত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি। এগুলি ছাড়াও প্রয়োজন শত্রুর মনোভাব ও তার চরিত্রের দিক বিশ্লেষণ করে দুর্বল জায়গাগুলি চিহ্নিত করা। চীনের একচেটিয়া আধিপত্যের বাসনাকে চুরমার করতে আমাদেরও চীন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে হবে। ভারতকে শক্তিধর হিসেবে উঠে এসে অন্যান্য ক্ষমতাশালীদের দলের সদস্য হতে হবে।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক ও রাজ্যসভার সদস্য)

শোক সংবাদ

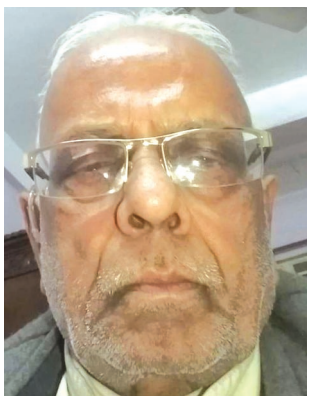

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা কার্যকর্তা জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল গত ১ জুলাই শিলিগুড়ির নিবেদিতা নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর বড়ো কন্যা হেমলতা গোয়েল উত্তরবঙ্গ কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছেন। ছোটো কন্যা অর্চনা আগরওয়াল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দায়িত্ব পালন করছেন। বড়ো পুত্র প্রবীণ আগরওয়াল সঙ্ঘের বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ এবং লঘু উদ্যোগ ভারতীর প্রান্ত সহ সভাপতি।

জগদীশজী সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক। নগরস্তর থেকে প্রান্তস্তরের বিভিন্ন দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর পুরো পরিবার সক্রিয়ভাবে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রজীবনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সক্রিয় কার্যকর্তা ছিলেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের বিদ্যাভারতীর শারদা শিশুতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

তফশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিয়েছিলেন

প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতের সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাশ করার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রের শাসক দলের একাধিক নেতাকে পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী তথা তৎকালীন তফশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কথাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন অবিভক্ত বাঙ্গলার তফশিলি জাতির (এখনকার পরিভাষায় 'দলিত') নেতা। যেমন সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ছিলেন ড. বি আর আম্বেদকার। ড. আম্বেদকার ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বহু আন্দোলন করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বা যোগেন মণ্ডল ড. আম্বেদকারের মতো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন না বা ড. আম্বেদকারের মতো পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক অধিকার রক্ষার জন্য ধারাবাহিক আন্দোলনের কোনো ইতিহাস ছিল না। তিনি ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন।

যোগেন মণ্ডল জন্মেছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার এক নমঃশূদ্র পরিবারে, ১৯০৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। ১৯২৯ সালে তিনি বিএ পাশ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭-এ তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। তিনি দলিত-মুসলমান সখ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই মুসলিম লিগের পক্ষালম্বন করে পাকিস্তানের দাবিতে লড়েছিলেন। দেশ ভাগের পরে পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর ভ্রান্ত রাজনীতির ফল তিনি ভোগ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কীভাবে মুসলিম লিগ তাঁকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হিন্দুদের ধ্বংস করে তাদের ইসলামিক রাজত্ব কয়েম করার পথকে সুগম করেছিল।

ভারতকে ঘৃণা করে তফশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারতকে ত্যাগ করেছিলেন, অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিয়ে ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় বাকি জীবন কাটান। আত্মঘাতী রাজনৈতিক নেতাদের যোগেন মণ্ডলের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

মুসলিম-দলিত ঐক্যের স্বপ্ন তাঁর চুরমার হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভারতে পালিয়ে এসে পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর। যে মাটিকে তিনি অবহেলা করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন সেই ভারতের মাটিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন১৯৬৮ সালে।

ভারতের সামাজিক পরিবেশে তপশিলি জাতিভুক্ত লোকেদের বর্ণহিন্দুদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণার কারণে তারা নিজেদের মুসলমানদের স্বাভাবিক মিত্র বলে মনে করে। তাদের নেতারাও তাই ভাবেন। তারা মনে করেন— 'তফশিলি ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়ে বড়ো কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নেই পৃথিবীর বুকে' (মরনিং নিউজ-পৃঃ -৪, ৭/৬/৪৭)। যোগেন মণ্ডলও তাই ভাবতেন। যদিও তাদের সর্বভারতীয় নেতা ড. ভীমরাও আম্বেদকর এই মত পোষণ করতেন না। ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, ''তপশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল।'' তিনি বলেছেন, 'বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের হিসেবেই গণ্য করে, তাদের মতে এই কাফেরদের রক্ষা করার চেয়ে মেরে ফেলাই উচিত।'' ড. আম্বেদকার সুস্পষ্ট ভাবে মনে করতেন— 'মুসলমান রাজনীতিবিদরা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাত্রাকে তাদের রাজনীতির ভিত্তি বলে স্বীকার করেন না' (Dr. Ambedkar Vol. 8/236)। যোগেন মণ্ডল বাবাসাহেবের মতো এত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন না। তফশিলিদের (দলিত) নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতা দখলের জন্যই তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন। এখনো বেশিরভাগ তফশিলি নেতা

মুসলমানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্যাঁচপয়জার কষেন। আসলে মুসলমান ও পিছিয়ে পড়া সমাজের নেতারা পরস্পর পরস্পরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।

আগেই বলেছি যোগেনবাবুর রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৫-এর 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিয়ম মেনে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের ১১টি ব্রিটিশশাসিত প্রদেশে প্রাদেশিক আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় যোগেনবাবু পূর্ববঙ্গের বরিশাল থেকে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হয়ে বাঙ্গলার প্রাদেশিক আইন সভায় জয়লাভ করেছিলেন।

এই সময় অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তাদের দুটি দল ছিল— জিন্নার মুসলিম লিগ, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। কংগ্রেস সমেত কোনো দলই এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে প্রাদেশিক সরকার গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু শর্ত ছিল তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন (তখন প্রদেশের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো)। কংগ্রেস সেই শর্তে রাজি না হওয়ায় ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে মিলে বঙ্গপ্রদেশে সরকার গঠন করেন। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক দল ছিল না। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে কংগ্রেসের এই ভুল রাজনীতির ফলে বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লিগ ফজলুল হকের ঘাড়ে ভর করে তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির থাবা বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লিগ তাদের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান গঠনের জন্য প্রস্তাব পাশ করলো। তখন ভারতের ভারতের কমিউনিস্টরা কিন্তু মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৪১ সালে রাজনীতিতে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নার মতভেদ সৃষ্টি হলো। জিন্নার কলকাঠি নাড়ার ফলে দেখা গেল ১ ডিসেম্বর মুসলমান মন্ত্রীরা সকলে এক সঙ্গে হক মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ঠিক হয়েছিল গভর্নর মুসলিম লিগ নেতা নাজিমুদ্দিনকে পরবর্তী সরকার গড়তে ডাকবেন। কিন্তু মুসলিম লিগের পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগকে বাঙ্গলার শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে রাখার জন্য অসাম্প্রদায়িক ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সমর্থনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিলেন নিজের রাজনৈতিক কৌশলের জোরে। ফলে গভর্নর হারবার্ট ১০ ডিসেম্বর ফজলুল হক-কে আবার সরকার গড়ার জন্য ডাকতে বাধ্য হন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে আবার তৈরি হয়— প্রোগ্রেসিভ কয়ালিশন সরকার। লোকে বলত— শ্যামা-হক সরকার।

আবার মুসলিম লিগ নানারকম কূটকাচালি আরম্ভ করলো এই সরকারের পতন ঘটাবার জন্য। মুসলিম লিগের এই কাজে বাঙ্গলার গভর্নর জন হারবার্টের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। ৪২-এর শেষের দিকে যোগেন মণ্ডল মুসলিম লিগের খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন। তিনি ইতিমধ্যেই হক-বিরোধী-সদস্য বলে পরিচিত হয়ে গেছেন। যোগেনবাবু তাঁর তফশিলি সদস্যদের নিয়ে লিগের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দেখা গেল তিনি ২১ জন তফশিলি সদস্যের সমর্থন জোগাড় করে হক-মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। ফলে ১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ বঙ্গপ্রদেশে সরকার গঠন করে। যোগেন মণ্ডল ও তাঁর দল ওই মন্ত্রীসভায় তিনটি আসন পান। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল— সমবায় ও ঋণ দান, প্রেমহরি বর্মণ— বন ও আবগারি, পুলিনবিহারী মল্লিক— প্রচার বিভাগ পেলেন।

১৯৪৩ সালের মে মাসে যোগেনবাবু গঠন করেন বঙ্গীয় তফশিলি ফেডারেশন। যদিও এর আগে ১৯৪২ সালে ড. আম্বেদকর গঠন করেছিলেন নিখিল ভারত তফশিলি ফেডারেশন। যোগেনবাবু জাগরণ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন তার দলের মুখপত্র হিসেবে। এরপর যোগেনবাবু তাঁর কাগজ ও দল নিয়ে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের হাত শক্ত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন।

১৯৪৫-এর ২৮ মার্চ কৃষি বাজেট পাশ করতে না পারার জন্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং গভর্নরের শাসন চালু হয়। এক বছর পর ১৯৪৬ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার মুসলিম লিগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে সুরাবর্দির নেতৃত্বে। সুরাবর্দির ক্যাবিনেটে মন্ত্রীর পদ পেলেন যোগেনবাবু। আসলে মুসলিম লিগ নেতা জিন্না ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। তিনি যোগেনবাবুকে মন্ত্রীপদ, ক্ষমতা ইত্যাদি দান করে দেখাতে চাইলেন যোগেনবাবুই ভারতে তফশিলিদের অবিসংবাদিত নেতা। যোগেনবাবু তাঁর দল নিয়ে পুরোপুরি জিন্নার পিছনে থাকায় জিন্না দাবি করেন তফশিলি (এখন বলা হয় দলিত) ও মুসলমান জনগোষ্ঠী মিলিয়ে সারা ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি তিনিই। কাজেই তাঁর দাবি মানতে হবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছিল ভারতের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি বাস্তবসম্মত পথ খুঁজে বের করতে। জিন্না তাঁর পাকিস্তান দাবির পক্ষে অনড় থাকেন। যোগেনবাবু জিন্নার পাকিস্তান দাবিকে জোরাল ভাবে সমর্থন করেন।

জিন্না যখন দেখলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তান দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি জিহাদের পথ অবলম্বন করবেন ঠিক করলেন। ১৯৪৬ সালের ২৭-২৯ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে তাদের পাকিস্তান দাবি মানা না হলে ১৬ আগস্ট থেকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন করে তারা পাকিস্তান আদায় করে নেবে। যোগেনবাবু লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আসলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ছিল চতুর

শব্দবন্ধের আড়ালে ইসলামিক জিহাদ, যার মাধ্যমে কাফেরদের (অমুসলমান) ধ্বংস করে ইসলামের রাজত্ব দার-উল-ইসলাম কায়েম করা হয় এবং জিহাদ করা মুসলমানদের কাছে পবিত্র কাজ; জিহাদ করলে জান্নাতে (স্বর্গে) গিয়ে সুখসম্ভোগের অঢেল ব্যবস্থা পাকা। আমাদের সেকুলার নেতারা হয়তো ভেবেছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশন মানে হরতাল বা ওই জাতীয় কিছু তীব্র আন্দোলন হবে, তাই সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

অবশেষে ৪৬-এর ১৬ আগস্ট এসে গেল। ওটা ছিল রমজান মাসের শুক্রবার, মুসলমানদের পবিত্র দিন। হিন্দুদের ধারণা ওইদিন ওরা ভালো পবিত্র কাজ করবে। যাদের ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশুনা করা নেই তারা জানেই না যে কাফের (অমুসলমান)-দের নিধন করা তাদের একটি পবিত্র কাজ। ওইদিন জুম্মার নমাজের পরে মুসলমানরা শহিদ মিনার ময়দানে জমায়েত হলো। মুসলিম লিগের নেতারা গরম গরম উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন। তার পরেই জেহাদি মুসলমান জনতা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট, মন্দিরে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু হত্যা, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন। তিনদিন ধরে চলেছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশন নামক এই নারকীয় পৈশাচিক কাজ। প্রায় ৫ হাজার মানুষ মারা যায় , আহত হয় ১৫ হাজার। ইতিহাসে একে 'দ্য গ্রেট কালকাটা কিলিংস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এত বড়ো ঘটনার পরেও অহিংসার পূজারি গান্ধীজী ছিলেন আশ্চর্য রকমের নীরব।

বাঙ্গলার শাসনব্যবস্থায় তখন মুসলিম লিগ সরকার। সুতরাং পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। মুসলিম লিগ ক্যাবিনেটের মন্ত্রী যোগেনবাবু ক্ষমতার মোহে আশ্চর্য অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই দাঙ্গা মুসলমান আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এই দাঙ্গা তফশিলিদের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং এই ব্যাপারে তার বলার কিছু নেই। যদিও জিহাদিরা যখন হিন্দু নিধন করে তখন কে উচ্চবর্ণ আর কে নিম্নবর্ণ তা দেখে করে না। সব হিন্দুই তাদের মতে কাফের, সুতরাং বধযোগ্য।

এই ভয়াবহ ঘটনার পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ। তখন মুসলিম লিগ সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন যোগেনবাবু। তিনি চারজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য এবং কংগ্রেস থেকে চারজন তফশিলি সদস্যের সমর্থন জোগাড় করে মুসলিম লিগ সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে কোনো সদুত্তর মিলছে না দেখে আবারও ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পরিকল্পনা করে মুসলিম লিগ। এবার স্থান ঠিক হয় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি। ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন থেকে নোয়াখালিতে অ্যাকশন করে মুসলিম লিগের জিহাদি বাহিনী। হাজার হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ি দোকানপাট লুঠ, মন্দিরে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। হাজার হাজার হিন্দু খুন করা হয়, হাজার হাজার হিন্দুমেয়ে অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। শত শত হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে চলে এই হিন্দু নরসংহার। সরকারি সমর্থন না থাকলে এরকম পৈশাচিক কাজ করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসে একে নোয়াখালি জেনোসাইড নাম দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান জিহাদিদের নৃশংসতার হাত থেকে তফশিলি হিন্দুরাও কিন্তু ছাড় পায়নি। সব অমুসলমানই তাদের কাছে কাফের। লিগের ক্যাবিনেট মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তার দলের লোকদের মাধ্যমে তফশিলি মানুষদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাচ্ছিলেন কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু যোগেনবাবু না দেখার ভান করে থাকলেন। ঘটনার পরে লোক দেখানো তদন্তের জন্য কয়েকজন মন্ত্রী ও লিগ নেতার একটি সরকগারি দল নোয়াখালি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। যোগেনবাবুও ছিলেন সেই দলে। যোগেনবাবুর নেতৃত্বাধীন তদন্তকারী সরকারি দল নোয়াখালি পরিদর্শন করে এসে মিথ্যে রিপোর্ট দিলেন— 'পরিস্থিতি তেমন জরুরি বা ভয়াবহ নয়। তফশিলিদের একজন লোকও নিহত বা আহত হয়নি।' কী ভয়ানক মিথ্যা! এখনকার মতো মিডিয়া তখন ছিল না। কয়েকটি কাগজ যাও-বা ছিল সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা ছিল তাদের উপর। তাই প্রকৃত খবর সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি।

জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের কাছে অবশেষে আত্মসমর্পণ করল কংগ্রেস। ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত হলো। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলিম লিগের সরকার চলছে, তাই জিন্না পুরো বঙ্গপ্রদেশকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলো। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং বাঙ্গলার প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পুরো বঙ্গপ্রদেশ যদি মুসলমানদের শাসনাধীন হয় তবে হিন্দু বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তিনি বঙ্গ বিভাগ করে হিন্দুবহুল অংশকে ভারতভুক্ত করার জন্য তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পুরো উলটো কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি সমগ্র বাঙ্গলা ঘুরে ঘুরে তফশিলিদের মধ্যে বঙ্গভাগের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মুসলিম লিগের জয়গান গেয়ে তিনি বলতেন, ''তফশিলি জাতি হিন্দুদের আওতায় থেকে ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোনো জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সঙ্গে বাস করতে বেশি পছন্দ করে''। যাই হোক, ড. শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনই জয়যুক্ত হয়েছিল। বঙ্গ ভাগ করে হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত পাশ হলো।

পুরো বঙ্গপ্রদেশ হস্তগত করার জন্য জিন্না আর একটি নতুন চাল চেয়েছিলেন, তার অনুগত সুরাবর্দির মাধ্যমে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে। এ ব্যাপারে সঙ্গে পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ কিছু নেতা এবং তাঁদের অনুগামীদের। তাঁরা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি 'স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গলা' গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জিন্নার ধান্দা ছিল একবার পুরো স্বাধীন বাঙ্গলা বানাতে পারলে তারপর নির্জীব

হিন্দু বাঙ্গালিদের মেরেকেটে ধর্মান্তরিত করে ইসলামিক দেশ বানাতে কঠিন হবে না। জিন্নার এই চালটিও ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ।

অবশেষে ৩ জুন ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারতের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল ঘোষণা করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ৫ আগস্ট যোগেনবাবু করাচির উদ্দেশে দিল্লি ত্যাগ করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসে ১০ আগস্ট। ওইদিন যোগেনবাবু তাঁর ভাষণে মহম্মদ আলি জিন্নাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ এবং মহত্তম ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেন।

মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান গঠিত হয়ে গেল। এবার দার-উল-ইসলাম গঠনের পরবর্তী ধাপের কাজ। অমুসলমানদের হয় তাড়াতে হবে নয়তো তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান বানাতে হবে। শুরু হলো পরিকল্পিত ভাবে এথনিক ক্লিনজিং-এর কাজ। ১৯৫০ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। রাষ্ট্রীয় ধর্মান্তরকরণের কাজ। তাতে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ , তফশিলি কেউ বাদ গেল না। প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু খুন হলো। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো। যোগেনবাবু নানারকম ভাবে চেষ্টা করলেন তফশিলিদের বাঁচাতে। যেমন করাচিতে তিনি একটি অদ্ভুত নিয়ম চালু করেছিলেন— যে সমস্ত তফশিলি কাজকর্মে বাইরে বেরুবে তাঁরা পোশাকে চাঁদ-তারা শোভিত একটি ব্যাজ পরবে এবং তাতে 'ডিপ্রেসড ক্লাস' কথাটি লেখা থাকবে। যাতে মুসলমানরা তাদের চিনতে পারে এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে কিছু না করে। কিন্তু যোগেনবাবু ড. আম্বেদকরের মতো ইসলামের তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মুসলমানদের চোখে অমুসলমান মাত্রেই কাফের এবং হত্যার যোগ্য। দার-উল-ইসলামে তাদের কোনো জায়গা নেই। হয় মুসলমান হও না হয় মর। কাজেই তফশিলিরাও রেহাই পেল না। যোগেনবাবু আইনমন্ত্রী হয়েও তাদের রক্ষা করতে পারছিলেন না।

ভারতেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হলো। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. বি আর আম্বেদকর, মহীশূর থেকে নির্বাচিত সাংসদ হনুমান্তাইয়া প্রমুখ নেতা জনবিনিময়ের দাবি তুললেন ভারতের সংসদে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকতআলি খানকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ করে এনে ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল একটি চুক্তি করেন। যাকে 'নেহরু -লিয়াকত চুক্তি' বলা হয়। এই চুক্তির বলে ঠিক হয় উভয় দেশের সরকার নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের যাবজীয় নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। সংখ্যালঘুরা যাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেশ ছেড়ে না যান সরকার সেটা দেখবেন। যারা ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে গেছেন তারা যাতে আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত হয় সরকার সে ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন ইত্যাদি। ড. শ্যাপাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারত সরকার এই সমস্ত ব্যাপার যথাযথ ভাবে পালন করলেও পাকিস্তান তাদের দেশের সংখ্যালঘুদের অর্থাৎ হিন্দু শিখদের জন্য এই চুক্তি পালন করবে না এবং এতে মুসলমানদের অবস্থা ভালো হলেও হিন্দুদের কোনো সুরাহাই হবে না। এই চুক্তির প্রতিবাদে তিনি নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল ড. শ্যামাপ্রসাদের অনুমানই ঠিক হলো। ভারত নিষ্ঠার সঙ্গে চুক্তি পালন করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও তাদের যাবতীয় অধিকার রক্ষা করলেও পাকিস্তান ওই চুক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের পরিকল্পিত ইসলামাইজেশন চালিয়ে যেতে লাগলো। যোগেনবাবু ওই চুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে তার ভরসায় থেকে যাওয়া মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিত তফশিলিদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকলেন। চুক্তির যথাযথ মান্যতা দিয়ে পাকিস্তানে তফশিলিরা যাতে মানসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে তাই নিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে নানারকম প্রস্তাব, নানারকম সুপারিশ নিয়ে তৎপরতা আরম্ভ করলেন। পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য যোগেনবাবুর এই তৎপরতায় যথেষ্ট বিরক্ত হলো এবং যোগেনবাবু এই নিয়ে যাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করেন তাই নিয়ে হুঁশিয়ারি দিল। যোগেনবাবু তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করলেন পাকিস্তানের কাছে তাঁর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে, তাঁর কথায় কোনো কাজই হচ্ছে না। সুতরাং তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এও উপলব্ধি করলেন পাকিস্তানে থেকে পদত্যাগ করলে তাঁর প্রাণ সংশয় হতে পারে বা বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে হতে পারে। তাই ভারতে অবস্থানরত অসুস্থ ছেলেকে দেখতে আসার নাম করে ভারতে আসেন এবং ভারত থেকেই তাঁর দীর্ঘ পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি কীভাবে মুসলিম লিগের সেবা করেছেন, মুসলিম লিগকে কোন কোন রাজনৈতিক সংকটে কী কী ভাবে সাহায্য করেছেন, এই সমস্ত করেও তিনি যে হিন্দু বা অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকেদের কোনো উপকারই করতে পারেননি , বরং তারা মুসলিম আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা তিনি ওই পদত্যাগ পত্রে বিবৃত করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন— ''দীর্ঘ বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত নয়। উচ্চবংশীয় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন তফশিলি গোষ্ঠীভুক্ত অনেক লোক ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সকল অভিশপ্ত হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যাবে আমার আশঙ্কা ধীরে ধীরে পরিকল্পনামাফিক তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হবে, নয়তো তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে।''

যে ভারতকে ঘৃণা করে তফশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারতকে ত্যাগ করেছিলেন, অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিয়ে ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয় বাকি জীবন কাটান। আত্মঘাতী রাজনৈতিক নেতাদের যোগেন মণ্ডলের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ■

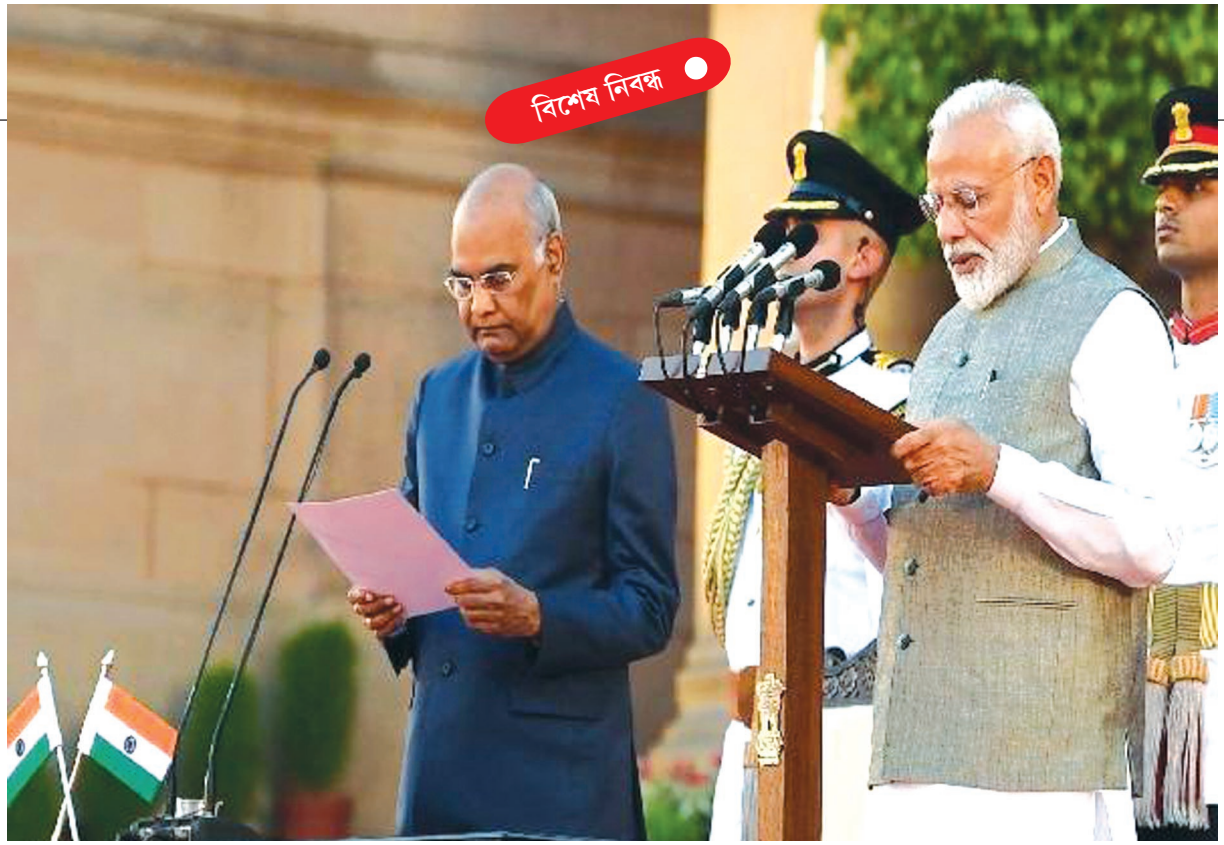

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের এক ইঞ্চি জমিও কেউ দখল করতে পারেনি

মনীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি লাদাখে চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় প্রতিদিনই আক্রমণ করে চলেছেন রাহুল গান্ধী। লাদাখের জমি চীনের দখলে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সারেন্ডার মোদী বলেও কটাক্ষ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'লাদাখের জমি মোদী সরকার চীনের হাতে তুলে দিয়েছেন।'

আগ্রাসী চীনের অপ্ররোচিত আক্রমণের মুখে দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, দলমত নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের পাশে দাঁড়ানো। ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে আক্রমণের এটা সময় নয়। সীমান্তে সৈন্যবাহিনী লড়াই করছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেনাপ্রধান। সেই ভাবে এই লড়াইয়ে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে। এই সময়ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করা সুনাগরিকের কর্তব্য নয়; তাও মিথ্যা অভিযোগ। কেননা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ দখল করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস যা করেছে তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। কেন নজিরবিহীন তারই সপক্ষে কংগ্রেসের করা কতকগুলি ভুলের খতিয়ান তুলে দিচ্ছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি ভারতকে হারাতে হয়েছে কংগ্রেসের শাসনকালে। বলা ভালো, রাহুল গান্ধীর 'চাচা নেহরু'র আমলে। বলতে বাধা নেই, স্বাধীনোত্তর ভারতের সমস্ত ভূ-রাজনৈতিক সংকট তাঁরই মূর্খামির ফলশ্রুতি। এছাড়া তিনি যে ভুল করে গেছেন তার খেসারত দিতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত বর্তমান ভারতকে।

১৯৪৭-এর অক্টোবর, পাকিস্তানের ট্রাইবাল আর্মি কাশ্মীরে প্রবেশ করলে সর্দার প্যাটেল ভারতীয় ফৌজ পাঠালেন কাশ্মীরের মহারাজাকে সহায়তা করার জন্য। ভারতীয় সেনা যখন পাকিস্তানের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে নেহরু তখন একতরফা ভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। লাখো পাকিস্তানি সৈন্য বন্দি হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ দান করে দিলেন পাকিস্তানকে এবং নিজে জল ঘোলা করে খাওয়া চতুষ্পদ প্রাণীর মতো কাশ্মীরকে টেনে নিয়ে গেলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে এবং পাকিস্তান দ্বারা ভারতের রক্তক্ষরণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফিরে এলেন দেশে।

১৯৪৭-এ ওমান ভারতকে প্রস্তাব দিয়েছিল গোয়াদর বন্দর ভারতকে নেওয়ার জন্য, কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পাকিস্তান তা লুফে নিল। পরে চীনকে দিল। আর চীন আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল।

স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি নিউক্লিয়ারের উপর এক্সপেরিমেন্ট ও নিউক্লিয়ার সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করে, কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করলেন। ওই প্রস্তাব গ্রহণ করলে চীনের আগে এনএসজি-র প্রথম সদস্য হতো ভারত। আজ ৭২ বছর অপেক্ষা করতে হতো না।

১৯৫০-এ নেহরু বার্মাকে কোকো আইল্যান্ড দিলেন উপহার হিসেবে। বার্মা বিক্রি করল চীনকে। আর চীন ভারতের নৌবাহিনীর উপর নজরদারি শুরু করে দিল।

১৯৫০ সালে আমেরিকা ভারতকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়, কিন্তু পরের ধনে ধনী, পরের বলে বলীয়ান দানবীর নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করে চীনের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৫৫ সালে আমেরিকা ও রাশিয়া যৌথভাবে ভারতকে পুনরায় প্রস্তাব করল। নেহরু স্বমহিমায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বালুচিস্তানের নবাব খান চিঠি লেখেন নেহরুকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন পরেই পাকিস্তান কবজা করে বালুচিস্তান। এখন চীন বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে পাকিস্তানের সহায়তায়।

১৯৫১ সালে নেপালের রাজা ঘিরিভুবন নেপালকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলশ্রুতি চীনের প্ররোচনায় সেই নেপাল এখন ভারতের কিছু অংশকে নেপালের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে দেখাচ্ছে।

১৯৫২-তে অতি দয়ালু নেহরু (যিনি নিজস্বার্থে দেশকে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না) কাবাও ভ্যালি বার্মাকে দান করলেন। এর আয়তন ২২,৩২৭ বর্গকিলোমিটার। কাশ্মীরের মতো আর এক ভূস্বর্গ। বার্মা তা চীনকে বিক্রি করে দেয়। আর চীন ভ্যালি এলাকায় আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হলে বিমানবাহিনী তার প্ল্যান অনুযায়ী চলতে চেয়েছিল। নেহরু না করে দিলেন। বললেন, 'আকসাই চীনের কোনও গুরুত্ব নাই। কারণ একগোছা ঘাসও জন্মায় না'। পরাজয় স্বীকার করলেন। চীনকে ৪৩,০০০ বর্গকিলোমিটার জমি ভেট হিসেবে দিলেন। আর ভারতের তিন হাজারের বেশি সেনা শহিদ হলেন।

আকসাই চীনকে যখন চীনের হাতে তুলে দেওয়া হলো, তখন সংসদে এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়েছে। সে সময় জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'যেখানে একটা ঘাসও জন্মায় না সেই ভূখণ্ড নিয়ে বিবাদ করে কী লাভ।' জবাবে তাঁর দলের এক সাংসদ মাথার টুপি খুলে নিজের টাকমাথা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এখানেও একটা ঘাস জন্মায়নি। তাহলে আমার মাথাটাও কেটে ফেলুন।'

আকসাই চীন নিয়ে চীনের যে স্ট্র্যাটেজিক লাভ হয়েছে তা বিপুল। তিব্বত ও জিনজিয়াং প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনই শুধু নয়, সমস্ত হিমালয় অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। পক্ষান্তরে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ হারিয়েছে। কারণ নেহরুর জীবনে লড়াই করে কিছু আদায় করতে হয়নি। বোকা সুভাষ জীবনের বাজি রেখে লড়াই করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। আর নেহরু গান্ধীর তোষামোদ করে মসনদ দখল করেছেন। তাই এই ভুলের খতিয়ান। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যতই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখান, এরকম গদ্দার থাকলে দেশ আরও টুকরো টুকরো হবে।

নেহরু এত ভুল করার পরেও রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা রাজনৈতিক পরিপক্কতার অভাবই প্রমাণ করে। ■

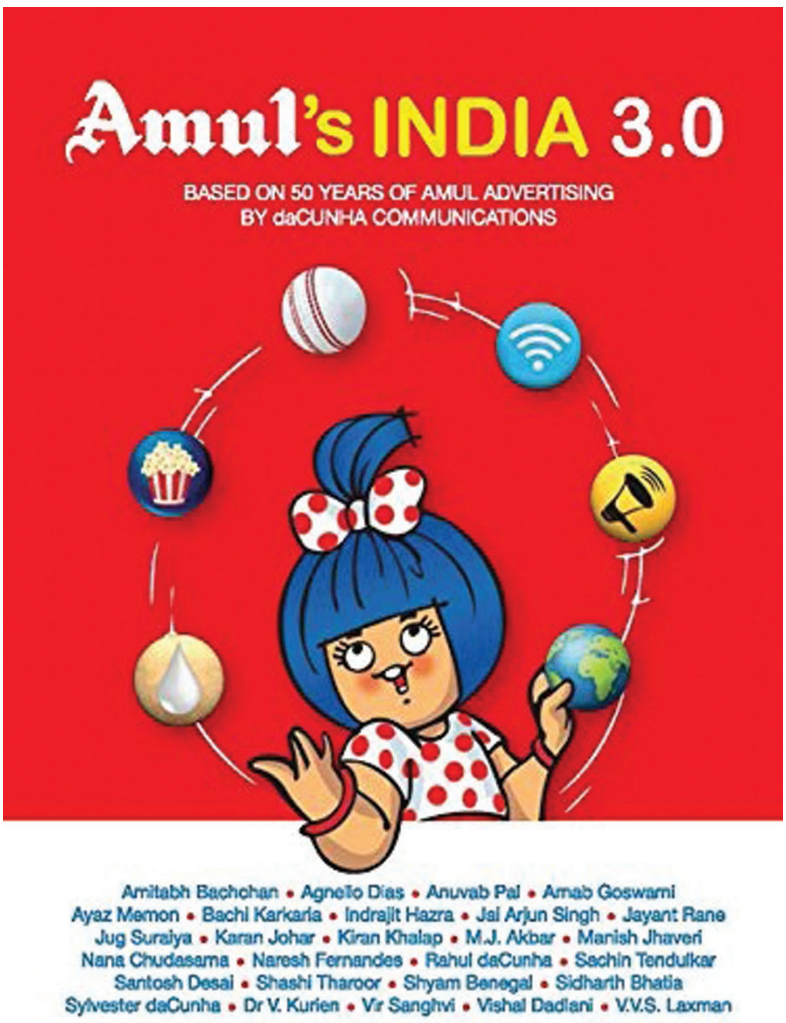

চীনা পণ্য বয়কট ও স্মতর্ব্য বিষয়

স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিলিতি কাপড় বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। চরকা আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। আজ সারা দেশ জুড়ে তীব্র হয়ে উঠেছে চীনা পণ্য বয়কটের ডাক। চীন ভারত সীমান্তে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ২০ জন জওয়ানের নৃশংস মৃত্যুর হাহাকার ফুটে উঠেছে প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে। কোভিড আতঙ্কের মধ্যেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদমুখর। আগ্রাসী বিশ্বাসঘাতক চীনের প্রতি এ যেন ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'থ্রি ইডিয়টস'-এর ফুংসুক ওয়াংডু চরিত্র লাদাখের বিখ্যাত মানুষ সোনম ওয়াংচুককে দেখেই অনুপ্রাণিত। সম্প্রতি তিনি সরাসরি অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন চীনের বিরুদ্ধে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। তিনি ডাক দিয়েছেন 'বয়কট মেড ইন চায়না', 'চীন কো জবাব সেনা দেঙ্গে বুলেটসে, নাগরিক দেঙ্গে ওয়ালেটসে'। সময় এসেছে চীনের আপেক্ষিক মিত্রতার মুখোশ ছিন্ন করার। লাদাখের আকাশে আজ বারুদের গন্ধ। বহুতলের ব্যালকনি থেকে চীনা টিভি আছড়ে ফেলার আবেগ এই বারুদের গন্ধকে কী প্রশমিত করতে পারবে? না, চীনা পণ্য বয়কটে চাই সুচিন্তিত দৃঢ় পদক্ষেপ।

বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন চীনাপণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন। বাড়ি ফ্ল্যাট তৈরিতে চীনা সামগ্রী কমানোর ডাক দিয়েছেন নির্মাণ সংস্থাগুলির সংগঠন ক্রেডাই। সর্বভারতীয় খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠন সিএআইটিও চীনাপণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন। গাড়ি শিল্প সূত্রের খবর, ভারতে তৈরি হওয়া গাড়ির যন্ত্রাংশের প্রায় ১০ শতাংশ আসে চীন থেকে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও ভারতে লগ্নি সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়নি। তাই আমদানি নির্ভরতা কমাতে দীর্ঘমেয়াদি ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জরুরি। নজর দিতে হবে লগ্নি সহায়ক তৈরির দিকে। স্মার্টফোনের ৭০ শতাংশ বিভিন্ন চীনা সংস্থার অধীন। ভিভো, ওপ্পো, রিয়েলমি, শাওমি, ওয়ানপ্লাসের মতো সংস্থাগুলির মালিকানা চীনা সংস্থাগুলির হাতে। মাইক্রোম্যাক্স, লাভা প্রভৃতি দেশি ব্রান্ডে ও চীনা যন্ত্রাংশের রমরমা। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে আত্মনির্ভরতার স্বপ্নের প্রধান অন্তরায় চীনা পণ্যের আধিক্য।

আলিবাবা, টেনসেনট, চুক্সি প্রভৃতি চীনা দৈত্যদের মোকাবিলা কোন পথে হবে। অ্যাপে গাড়ি বুক করার ওলা, নেটে টাকা মেটানোর পেটিএম, খাবারের জোগান দেওয়া সুইগি কিংবা জোম্যাটো, মাসকাবারির ফ্লিপকার্ট, পড়াশোনার অ্যাপ

বাইজু'স, হোটেল বুকিং-এর মেক মাই ট্রিপ প্রভৃতি সংস্থায় চীনাদের মোটা লগ্নি রয়েছে।

চীনা দ্রব্য বয়কটের আঁচ পেয়ে আগেভাগে চীন তার বাণিজ্য স্বার্থ বজায় রাখতে বাংলাদেশের বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। চীন বাংলাদেশের শুল্কযুক্ত পণ্যের শতকরা ৯৭ ভাগ শুল্কমুক্ত করার কথা জানিয়েছে। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশ এই সুবিধা পাবে। এসব ছল-চাতুরী করে চীন তার অর্থনৈতিক দুর্দশাকে লুকিয়ে রাখছে। সম্প্রতি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যান লি তাঁর বই 'Will China's Economy Collapse' গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাইরে থেকে জানা না গেলেও চীনের আন্তর্জাতিক ঋণ এখন ভয়াবহ। বিশ্বের দরবারে জিনপিং সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা এক বিরাট প্রশ্নের মুখে। বিশেষজ্ঞদের মতে হংকং, তাইওয়ান, উইঘুর মুসলমানদের বিদ্রোহ, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সাতটা দেশের সঙ্গে লড়াই, আর্থিক ঝিমুনি, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ, জাপানের সঙ্গে সেনকাকু দ্বীপ সংক্রান্ত সংঘাত, দুনিয়া জুড়ে সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ল্যাজে গোবরে হয়ে আছে চীন। অন্যদিকে গত ছ' বছরে ভারত যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে, তাও চীনের অপছন্দ।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারত ৬২৪০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে। দেশের আমদানির নিরিখে তা ১৪ শতাংশ। কোভিড পর্বে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। চীন থেকে প্রতি বছর বহু টাকার খেলনা, আসবাবপত্র, ঘড়ি ইত্যাদি পণ্য আমদানি করা হয়। এই রকম পণ্যের আমদানি বন্ধ করে দেশেই এইসব পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। দেশীয় খেলনা শিল্পের বিকাশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এব নতুন কর্মসংস্থানেরও দরজা খুলে যাবে।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে চীনা জিনিস ব্যবহার করা যদি দেশের পক্ষে এতই ক্ষতিকর তাহলে সরকার চীনা জিনিস ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন? বর্তমানে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও একটি বিশেষ দেশের সব পণ্য বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ করা যায় না। চিনা পণ্য কিনবো না কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি চীনা পণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মতর্ব্য, জনসাধারণ জাগ্রত থাকলে সরকারও সচেতন থাকবে এবং চীনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আমেরিকার আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। যুদ্ধের পরে দেখা গেল জাপানের বাজারে আমেরিকার পণ্যের অঢেল সরবরাহ। বোমাবিধ্বস্ত শিল্পহীন তৎকালীন জাপান সরকার আইনি বাধ্যবাধকতায় প্রতিবাদ করতে পারেনি। মার্কিন ব্যবসায়ীরা প্রথমে সস্তা দরে এবং পরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিখ্যাত কালিফোর্নিয়ার আপেল

বিলি করতে লাগল। জাপানিরা কিন্তু সেই আপেল সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের কারণে শিল্প এবং আর্থিক বিকাশের নিরিখে জাপান আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। যদি আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সংকল্পে অটল থাকতে পারি তবে আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

—অনু বর্মণ,
গোবিন্দ নগর, মদনপুর, নদীয়া।

করোনা প্রতিরোধে যোগ প্রাণায়াম জরুরি কেন

২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস। যদিও ভারত ঋষির দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ, তাই এখানে যোগের প্রাধান্যই বেশি। তথাপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় ২১ জুন তারিখটিকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি একজন যোগী পুরুষ এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী।

আমাদের মূল্যবান অর্গান হলো ফুসফুস। এর সাহায্যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করি। যার সাহায্যে আমাদের দেহের রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। এটা হয় মিনিটে ১৮ বার, তবে সেটা স্বাভাবিক অবস্থায়, হাঁপানি বা ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণের মতো সমস্যায় নয়। আমাদের দুই পাশে পাজোরের মধ্যে এটির অবস্থান। এটি সব সময়েই বায়ু এবং আদ্রতায় পরিপূর্ণ। যখন এই বায়ু থলি শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে তখন ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা কমে, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়। ঠিক করোনা বা সার্স জাতীয় ভাইরাস আক্রমণ করলে যেমন হয়। প্রশ্ন উঠছে— প্রাণায়ামে দেহের কি লাভ সম্ভব? প্রাণায়ামের ফলে রেসপিরেটরি অর্গান প্রচুর বায়ু গ্রহণে সমর্থ হয়, শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়, হার্ট ও নার্ভের ব্লকেজগুলি খুলে যায়, তার ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে। যদিও করোনা ভাইরাস সব শেষে গলা থেকে নেমে ফুসফুসকেই আঁকড়ে ধরে— তখনই ঘটে ভয়াবহ বিপদ। হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যেতেই পারে, মূলত এটা যখন শ্বাস সমস্যারই রোগ, তাই লাংসকে শক্তিশালী রূপ দিতে প্রাণায়ামের অতীব প্রয়োজন। মোদ্দা কথা, এতে দেখা যায়, যারা প্রতিনিয়ত প্রাণায়াম এবং প্রতিদিন ২০-২৫ মিনিট সূর্যের আলো সেবন করে, তাঁদের এ রোগের সম্ভাবনা মোটের উপর থাকবে না, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। তবে কিছু স্বাস্থ্য বিধি মানা এবং খাবারদাবারে যথেচ্ছাচার বন্ধ করা পালনীয় কর্তব্য বলে আমি মনে করি। যেমন নেশা বর্জন, প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জল সেবন, বয়স্কদের মাংস খাওয়া বর্জন, পুষ্টিকর অথচ লঘুপাচ্য খাদ্য গ্রহণ এবং এক ঘণ্টা ব্যায়াম, স্বাস্থ্যবিধি পালনের মধ্যে পড়ে। যোগ প্রাণায়াম যে প্রতিটি মানুষের দরকার এবং প্রত্যেকে এটাকে নিত্য কর্মপদ্ধতির মধ্যে রাখবে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

ধর্মনিরপেক্ষতা কি শুধু হিন্দুরাই দেখাবে?

ইসলামের অর্থ নাকি শান্তি। পৃথিবী জুড়ে যাবতীয় অশান্তির দায়দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে ইসলাম অনুগামীরা। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ যথা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, আমেরিকা আজ ইসলামি জঙ্গিদের দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আফজলগুরু, কাসব, লাদেন, দাউদ ইব্রাহিম, সাদ্দাম হোসেন এরা নিশ্চয়ই জঙ্গি হয়ে জন্মায়নি। পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি ও জন্মদাতাদের দেখেই এরা জীবিকা নির্বাহ ও সারা পৃথিবীতে একটা অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরি করে ডন সেজে মৌরুসিপাট্টা করে দিন অতিবাহিত করে চলেছে। তাই ওই দেশগুলি এদের শায়েস্তা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। গোপনে খবর জোগাড় করে ওই ডনদের হত্যা করে পৃথিবীর শান্তি ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশ ও রাজ্য গালভরা নাম ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মৌলবাদী ও সংখ্যালঘুদের যেভাবে তোয়াজ করে চলেছে, এই রাজ্যর অধিবাসী হয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় হিন্দুরা বুঝি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক! রমজান মাসে হিন্দু নেতা-নেত্রীদের ইফতার অর্থাৎ রোজা ভাঙার পর 'মুখে পানি' দেবার পর তাদের চব্যচোষ্য খাওয়ানোর জন্য সরকারি টাকার নয়ছয় করে থাকে তাতে সংখ্যালঘুরা বেশ মজা অনুভব করে। কারণ মহামান্য হাইকোর্টের একজন ব্যারিস্টার এক্রামুল বারি-র ইফতার সম্পর্কে বক্তব্য, যে ব্যক্তি রোজা রাখেনি বা রাখেও না, যে ব্যক্তি অমুসলমান তাদের ইফতারে যোগদান ইসলাম বিরোধী। কিন্তু মুসলমানরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, নেতা ও মন্ত্রীর অনুগ্রহ লাভের জন্য এসবের তোয়াক্কা না করে ইসলাম বিরোধী আচরণ করে চলেছে। আর রাজনৈতিক নেতারাও ভোট পাবার আশায় আনন্দে ইফতারে যোগ দিয়ে চলেছে।

সকলের স্মরণ থাকবে, নিশ্চয় রাজ্যের নেত্রীর বদান্যতায় তারকেশ্বরের মন্দিরের সর্বোচ্চ পদে একজন বিধর্মীকে বসানো হলো। কেন নেত্রীর কি ধর্মপ্রাণ কোনো মোহান্তকে পছন্দ হলো না? ধর্মনিরপেক্ষতার মেকি আদিখ্যেতা দেখানোর কী প্রয়োজন! কই কোনো মসজিদের সর্বোচ্চপদে কোনো হিন্দুকে বসানোর স্পর্ধা দেখাতে পারবেন কি? কোনো মতেই না। কারণ সেই ফরোয়ার্ড ব্লকের কলিমুদ্দিনের কথা সকল মুসলমানই অন্তরে পোষণ করে থাকেন, যে তারা প্রথমে মুসলমান পরে ভারতীয়। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী প্রায় মুসলমানই পাকিস্তানপন্থী। উদাহরণস্বরূপ ক্রিকেট খেলায় ভারত হারলে সেই পাকিস্তানপন্থীরা বোমা ফাটান আনন্দ প্রকাশ করেন, এতেও দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতা- নেত্রীদের টনক নড়ে না।

ফিরহাদ হাকিম এবারের শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিবের মাথায় জল ঢেলেছেন। কই উদার মুসলমানেরা কী কোনো হিন্দুকে মক্কা নিয়ে যেতে পারবেন? কখনই না। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে অন্ধ। ওটা ছাড়া কিছু বোঝে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার মেকি আদিখ্যেতা দেখিয়ে রাজ্যের হিন্দু নেতা-নেত্রীরা সনাতন ধর্মকে কলুষিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য বর্তমানে ভোটের জন্য নেত্রী পূজা আর্চায় মন দিয়েছেন হিন্দুভোট টানার জন্য। তাঁকে ভণ্ড ছাড়া আর কী বলা যাবে!

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।